রাজা হরিশ্চন্দ্র।

শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

তত্ত্বনিধি, বি, এ,

রাজা হরিশ্চন্দ্র।

(কম্বুলিয়াটোলা লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল দিবসে ষ্টার থিয়েটরে পঠিত।)

ভগবদ্গীতার
সম্পাদক, "অধ্যাত্মধর্ম্ম
ও অজ্ঞেয়বাদ" প্রণেতা, আদি
ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক প্রভৃতি

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
তত্ত্বনিধি, বি, এ,

কর্ত্তৃক প্রণীত।
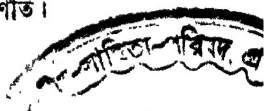
৫৫ নম্বর আপার চিৎপুর রোড,
আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় হইতে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

অদ্য শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে মীনরাশিস্থ
ভাস্করে চৈত্র মাসে ৩০ তারিখে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা প্রেস
৬৭ নং নিমতলা ষ্ট্রীট ও ৩৪৫ নং আপার চিৎপুর রোড,
মুখার্জী কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
মহাশয়ের করকমলে এই
ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রীতি
নিদর্শনরূপে উপ-
হৃত হইল।

যোড়াসাঁকো
চৈত্র, ১৮৯৮ } শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র।

রাজা হরিশ্চন্দ্র

ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মা-মবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারং।

আমি ঋত বলিব, আমি সত্য বলিব, সত্য আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা জানে না, এমন হিন্দু এই ভারতে, অন্তত এই বঙ্গদেশে আছে কি না সন্দেহ। বিশেষত আজকাল হরিশ্চন্দ্রকথা যাত্রাদলে গীত ও নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথের শীঘ্র অতীত হইতে পারিতেছে না। আমাদের কবি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে এই হরিশ্চন্দ্রকথা প্রবেশ করাইয়া দেওয়াতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার করুণরস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। এই হরিশ্চন্দ্রকথা যে কত লোকের নির্জীব ধর্ম্ম-

ভাবকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে, কতলোককে স্বার্থত্যাগের অধিক আত্মত্যাগে উৎসাহিত করিয়াছ, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও এই হরিশ্চন্দ্রকথা নানা সময়ে নানা অবস্থায় ধৈর্য্য সংযম প্রভৃতি বিষয়ে, কেবল কথা দ্বারা নহে, জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক দিন পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দিয়াছে, আজ তাহার দক্ষিণাস্বরূপে তৎসম্বন্ধীয় আমাদের দুই চারিটী সামান্য বক্তব্য সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

কবি কৃত্তিবাস যখন তাঁহার রামায়ণে সুদীর্ঘ হরিশ্চন্দ্রকথা প্রবেশ করাইয়াছেন, তখন স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তিনি খুব সম্ভবত কোন পুরাণ-গ্রন্থে তাহা পাইয়াছিলেন। আমরাও দেখি যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে কৃত্তিবাস-কথিত হরিশ্চন্দ্র-কথার অনুরূপ একটী হরিশ্চন্দ্রকথা রহিয়াছে। কিন্তু ইহাকেও আমাদিগের মূল কথা বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, ইহার প্রথমেই লেখা আছে—

"হরিশ্চন্দ্রেতি রাজর্ষিরাসীত্ত্রেতাযুগে পুরা।"

"পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামক এক রাজর্ষি ছিলেন।" ইহা হইতেও আমাদিগের

অনুমান হয় যে মূল হরিশ্চন্দ্রকথা মার্কণ্ডেয় পুরাণের বহু পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল। আর, বাস্তবিকও আমরা ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে (৭ম, ১৩) সর্ব্বপ্রথম হরিশ্চন্দ্রের নাম ও তৎসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কথা দেখিতে পাই। তাহার পর তদনুযায়ী কথা বাল্মীকি-রামায়ণে এবং মহাভারতেও দেখিতে পাই। এই সকল ঐতিহাসিক হরিশ্চন্দ্রকথা হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত পৌরাণিক কথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা যায়। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। সম্প্রতি ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ঐতিহাসিক হরিশ্চন্দ্রকথারই আলোচনায় সর্ব্বপ্রথম প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রকথা।

সেই হরিশ্চন্দ্রকথাটী এই। ব্রহ্মা হইতে পরম্পরাগত * ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিশ্চন্দ্র নামক এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। তাঁহার একশত পত্নী ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহাদের কাহারই গর্ভে তাঁহার পুত্র লাভ ঘটে নাই।

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে "হরিশ্চন্দ্রোহ বৈধস ঐক্ষ্বাকো রাজা অপুত্র আস।" ইহার অন্তর্গত "বৈধস" শব্দের অর্থে সুবিখ্যাত পণ্ডিত মার্টিন হোগ বেধস্ পুত্র

এক সময়ে পর্ব্বত ও নারদ নামে দুই ঋষি হরিশ্চন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। রাজা এক দিন নারদকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

---

করিয়াছেন। আমাদের তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই আখ্যানেই দেখা যাইবে যে, অজীগর্ত্ত নামক এক ঋষি তাঁহার পুত্রকে অঙ্গিরস্-কুলোদ্ভব বশত "আঙ্গিরস" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সেইরূপ এখানেও বেধস্ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে পরম্পরাগত অর্থে "বৈধস" শব্দের ব্যবহার অনুমান করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ হরিশ্চন্দ্র একজন সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাঁহার ব্রহ্মা হইতে বংশোৎপত্তি উল্লেখ করিতে যাওয়া খুব সম্ভব। এখনও ইংরাজ সম্রান্তদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, যাঁহারা প্রথম উইলিয়ম প্রভৃতি যত প্রাচীন রাজা হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি দেখাইতে পারেন, তাঁহারা আপনাদিগকে তত অধিক সম্মানিত বোধ করেন। ইহার উপরে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ আছে, সকলেতেই তাঁহাকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলা হইয়াছে এবং ত্রিশঙ্কুপুত্রও বলা হইয়াছে কিন্তু কোথায়ও তাঁহাকে বেধস্-পুত্র বলা হয় নাই। আরও, ব্রহ্মা হইতে এই ইক্ষ্বাকুবংশের উৎপত্তিবর্ণনা ঐ সকল গ্রন্থে স্পষ্টোল্লিখিত দেখা যায়। এই সকল কারণে আমরা "বৈধস্" শব্দের "বেধস্-পুত্র" না ধরিয়া "ব্রহ্মা হইতে পরম্পরাগত" এইরূপ অর্থই ধরিলাম।

সকলেই যে পুত্রমুখদর্শন প্রার্থনা করে, পুত্র লাভের ফল কি? নারদ দশটী মন্ত্রে পুত্রের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে উপদেশ দিলেন যে "বরুণরাজার নিকটে এই বলিয়া পুত্রের জন্য প্রার্থনা কর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহারই নিকটে তাহাকে যজ্ঞার্থে বলিদান করিবে।" হরিশ্চন্দ্রও বরুণরাজার নিকটে তদনুরূপ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে "আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার দ্বারা তোমারই যজ্ঞ করিব।" অবশেষে রোহিত নামে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। বরুণরাজা স্বীয় প্রাপ্য প্রার্থনা করাতে হরিশ্চন্দ্র স্বাভাবিক সন্তানবাৎসল্যবশত "বয়ঃক্রম আর একটু অধিক হউক" এইরূপ বৃথা আপত্তি করিয়া অনেকবার রোহিতকে বলিদান করিবার দায় হইতে এড়াইয়া গেলেন। কিন্তু রোহিত যৌবনে পদার্পণ করিলে যখন বরুণরাজা পুনরায় স্বীয় প্রাপ্য প্রার্থনা করিলেন, তখন হরিশ্চন্দ্র আর আপত্তি দ্বারা তাঁহার প্রার্থনা এড়াইতে না পারিয়া স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎস, যাঁহার কৃপায় আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, হায়! তোমারই দ্বারা সেই বরুণরাজার যজ্ঞ করিতে

হইবে।” রোহিত এখন বর্ম্মধারণের উপযুক্ত বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি যজ্ঞার্থে আপনাকে বলিস্বরূপে অর্পণ করিতে সহজে সম্মত হইবেন কেন? তিনি ধনুর্ব্বাণমাত্র সহায় করিয়া নিকটস্থ অরণ্যে পলায়ন পূর্ব্বক তথায় এক বৎসরকাল কোন রূপে কাটাইয়া দিলেন।

অনন্তর বরুণরাজার কুদৃষ্টিতে বা “আক্রমণে” ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের উদরস্ফীতি রোগ জন্মিল এবং রোহিত তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অরণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিতে-ছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে দেশ ভ্রমণের গুণবর্ণন করিয়া অরণ্য পরিত্যাগে নিরস্ত করিলেন। তিনি আর এক বৎসর অরণ্যবাস করিলেন। এইরূপে প্রতি বৎসরের শেষে তিনি যেই গ্রামে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, অমনি ইন্দ্রও ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত করেন। এই প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন ষষ্ঠ বৎসর অরণ্য ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময়ে তিনি ক্ষুৎপ্রপীড়িত সূয়বসনন্দন অজীগর্ত্ত ঋষিকে সেই বন মধ্যেই দেখিতে পাইলেন। অজীগর্ত্তের

তিন পুত্র—শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনোলাঙ্গূল। রোহিত অজীগর্ত্তের নিকটে গিয়া স্বীয় বিপদ্ বর্ণন করিয়া বলিলেন "হে ঋষি, আমি আপনাকে গো-শত প্রদান করিতেছি, তৎপরিবর্ত্তে আপনার এই পুত্রগণের মধ্যে একটীকে ক্রয় করিয়া তদ্দারা আমি নিষ্কৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা বলিয়া রোহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইতে যাইলে অজীগর্ত্ত "ইহাকে নহে" বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে অজীগর্ত্তপত্নী দিতে অসম্মত হইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে রোহিত মধ্যমপুত্র শুনঃশেপকে শত গাভীর বিনিময়ে গ্রহণ করিয়া একেবারে পিতা হরিশ্চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন "পিতঃ, আমি এই ব্রাহ্মণ বালককে যজ্ঞার্থে প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করি।" হরিশ্চন্দ্রও বরুণ-রাজার নিকটে জানাইলেন যে তিনি স্বীয় পুত্র রোহিতের পরিবর্ত্তে শুনঃশেপের দ্বারাই তাঁহার যজ্ঞ করিবেন। বরুণরাজা "ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণ আরও ভালই" ইহা বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। এই সূত্রে বরুণরাজা হরিশ্চন্দ্রকে রাজসূয় যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রও অভিষেচনীয় দিবসে

যজ্ঞীয় পশুর পরিবর্ত্তে শুনঃশেপকে যজ্ঞস্থলে রক্ষা করিলেন।

এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বসিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং আয়াস্য উদ্গাতা ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভকার্য্যগুলি সমাপন হইলে পর তাঁহারা শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিবার জন্য লোক অন্বেষণ করিলেন কিন্তু এই ভীষণ কার্য্যে উপস্থিত দ্বিজদিগের মধ্যে কেহই অগ্রসর হইলেন না। অজীগর্ত্ত লোভ বশতঃ স্বয়ং আসিয়া অপর একশত গাভীর বিনিময়ে তাহা করিতে স্বীকার করিলেন। শুনঃশেপ তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে নিহত করিবার লোক পাওয়া গেল না। এবারেও অজীগর্ত্ত লোভপরবশ হইয়া আরও এক শত গাভীর বিনিময়ে স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান করিতেও অগ্রসর হইলেন। এই খানে ঐতরেয় ঋষি বলিতেছেন যে, যখন শুনঃশেপ দেখিলেন যে তাঁহাকে পশুর ন্যায় সত্য সত্যই বলিদান করিবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন তিনি প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক ক্রমে ক্রমে নানা দেবতার স্তব পঠিত হইলে পর তাঁহার

বন্ধনদাম মুক্ত হইয়া গেল এবং হরিশ্চন্দ্রেরও পীড়ার উপশম হইল।

বন্ধনদাম মুক্ত হইয়া গেলে যজ্ঞের পুরোহিত-গণ শুনঃশেপকে আপনাদিগের মধ্যে আসন প্রদান করিয়া তাঁহাকেও রাজসূয়-যজ্ঞের কতকটা কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শুনঃশেপ সেই যজ্ঞাবসরে অঞ্জঃসব নামক এক প্রকার আসব আবিষ্কার করিয়া ঋষি হইলেন। অভিষেচনীয় দিনে সোমবলি দিয়া যজ্ঞাবসান হইল। যজ্ঞাবসানে তিনি বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন সৌয়বসি অজীগর্ত্ত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন "আমার পুত্র প্রতিপ্রদান কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন "দেবতারা ইহাঁকে আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি ইহাঁকে প্রতিপ্রদান করিব না।" অজীগর্ত্ত তখন শুনঃশেপকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন "এস, তোমার মাতা ও আমি, আমরা উভয়েই তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি অঙ্গিরস্-কুলোদ্ভূত ও অজীগর্ত্তপুত্র কবি শুনঃশেপ বলিয়া বিখ্যাত। অতএব হে ঋষি, তোমার পৈতামহ তন্তু (ancestral home) হইতে চলিয়া যাইও না; আমাদের নিকটে

ফিরিয়া আইস।” তদুত্তরে শুনঃশেপ বড়ই মনঃকষ্টের সহিত বলিলেন “শূদ্রও স্বীয় পুত্রবধার্থে অস্ত্র উদ্যত করে না, তুমি তাহাও করিয়াছ; হে আঙ্গিরস! তোমার নিকটে আমা অপেক্ষা তিনশত গাভী অধিক মূল্যবান্ বিবেচিত হইয়াছে।” তখন অজীগর্ত্ত মৃদুভাবে বলিলেন “বৎস! মৎকৃত পাপকর্ম্ম আমাকে অত্যন্ত তাপ প্রদান করিয়াছে, তোমাকে একশত গাভী প্রদান করিয়া সেই পাপ ধৌত করিতে ইচ্ছা করি।” শুনঃশেপ বলিলেন “এ প্রকার পাপ যে একবার করিতে পারে, সে দ্বিতীয় বারও তাহা করিতে পারে; তোমার মন হইতে শূদ্রোচিত এই নিষ্ঠুর ভাব এখনও অপসৃত হয় নাই; তোমার সহিত পুনর্মিলন হওয়া অসম্ভব।”

মুনি বিশ্বামিত্র তখন শুনঃশেপকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন “অজীগর্ত্তের সহিত তোমার পুনর্মিলন অত্যন্ত অসম্ভব। যখন সৌয়বসি অজীগর্ত্ত তোমার বধার্থে শস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি কি ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে আর পুত্ররূপে যাইও না, আমারই পুত্রস্থানীয় হও।” এই সময় হইতে দেবপ্রেরিত বলিয়া শুনঃশেপের

আর এক নাম হইল দেবরাত। দেবরাত শুনঃ-শেপ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি অঙ্গিরস্-কুলোদ্ভূত হইয়া এখন তাঁহার পুত্র হইলে কিরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বামিত্র পুত্র-গণের সমক্ষে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার দিলেন। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র ইহাতে অসন্তুষ্ট হওয়াতে পিতার শাপগ্রস্ত এবং মধুচ্ছন্দস্ প্রভৃতি কনিষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র সন্তোষের সহিত পিতৃ-আজ্ঞা পালন করাতে পিতার আশীর্ব্বাদভাজন হইলেন। এই রূপে দেবরাত শুনঃশেপ জহ্নু বংশের রাজকীয় মহিমা * এবং গাধিকুলের বিজ্ঞানে সমুজ্জ্বল হইলেন।

ঋগ্বেদে শৌনঃশেপ মন্ত্র।

ইহাই হইল ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত হরিশ্চন্দ্র-কথার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘট-নার চিত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে আমরা দেখি যে, ইহাকে শৌনঃ-শেপাখ্যান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আর সত্যসত্যই, এই আখ্যানে হরিশ্চন্দ্রের প্রাধান্য কিছুই নাই বলিলেও চলে—শুনঃশেপেরই

* অঙ্গিরস্কুলে জহ্নু নামক এক রাজর্ষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাহাত্ম্য সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল বৈদিক ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা শুনঃশেপ দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন, সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের নাম গন্ধও নাই; শুনঃশেপ যে নিজের নামোল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ আছে—

"শুনঃশেপো যমহ্বদ্গৃভীতঃ সোহস্মান্ বরুণো মুমোক্তু।" ১ম, ২৪সূ, ১২

"শুনঃশেপ গৃহীত হইয়া যাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, সেই রাজা বরুণ আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন।"

"শুনঃশেপোহ্যহ্বদ্গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং
দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো
বিমুমোক্তু পাশান্॥" ১ম, ২৪সূ, ১৩

"শুনঃশেপ গৃহীত ও তিন কাষ্ঠ দণ্ডে বদ্ধ হইয়া যাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাতিগ বরুণরাজা সর্ব্বতোভাবে পাশ সকল মুক্ত করিয়া দিউন।"

ঋগ্বেদে যখন এরূপ স্পষ্টভাবে নামোল্লেখ-পূর্ব্বক প্রার্থনা উল্লিখিত আছে এবং যখন ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এই শৌনঃশেপ আখ্যানের

বিস্তৃত বিবরণ দেখিতেছি, তখন এই আখ্যানকে একটী কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের বিশ্বাস যে এই হরিশ্চন্দ্র-সংযুক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। আমরা যেমন আমাদের পিতামহ ও প্রপিতামহগণসম্বন্ধীয় জ্ঞাত কথা আখ্যানচ্ছলে উল্লেখ করিতে পারি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্রকথাও পড়িলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে ঐতরেয় ঋষি ঋগ্বেদের শৌনঃশেপ মন্ত্র সমূহের উদ্ভব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞাত কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনা-জ্ঞাপক অতীতকাল (লিট্) ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ঋগ্বেদীয় মন্ত্র সমূহে বর্ত্তমান ভাবই সুব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় যে ঋগ্বেদ এবং তাহার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ন্যূনাধিক শতবর্ষকাল ব্যবধান পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে ঋষিরা ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত নাম ধাম ভুলিতে পারেন নাই, ঠিক ঠিক রাখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

ঋগ্বেদের শৌনঃশেপ ঋক্‌সমূহে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শৌনঃশেপ আখ্যানে এমন এক

সরলতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে যে, সেই গুলি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঋগ্বেদোক্ত উক্ত পাশ সমূহও কল্পিত পাশ নহে এবং ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যান কল্পিত উপাখ্যান নহে; উভয়েরই ভাষা, লিখি· বার রীতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ-ব্যঞ্জক (ইংরাজীতে যাহাকে realistic বা dramatic বলা যাইতে পারে।) ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যানে কেবল বরুণ-রাজার (অথবা ভগবানের) প্রত্যক্ষ আবির্ভাবরূপ কবিত্বের একটু আবরণ রহিয়াছে। *

বৈদিক হরিশ্চন্দ্র-কথা হইতে ঐতি-হাসিক তথ্য সংগ্রহ।

এখন আমরা ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্রকথা অথবা শৌনঃশেপ আখ্যান আলোচনা করিয়া কি ঐতিহা-সিক সত্যরত্ন সকল সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাই দেখা যাউক। আমাদের বোধ হয় যে, এই আখ্যানের মূল সূত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের

---

* ঋগ্বেদোক্ত শৌনঃশেপ মন্ত্রগুলি যে হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক শুনঃশেপের বন্ধন বিষয়েই লিখিত হইয়াছে, এবিষয়ে একেবারে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি না। তাহার কারণ, প্রথমত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র সমুহে হরিশ্চন্দ্রের কোন প্রকার নামই দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা

বিরোধ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ সূত্রেই এই আখ্যানোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই আখ্যান উক্ত হইবার অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে, বিশ্বামিত্র রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের

দেখিতে পাই যে শুনঃশেপ বন্ধনমুক্ত হইবার পর অঞ্জঃসব নামক আসব আবিষ্কার করিলেন; কিন্তু অঞ্জঃসব সম্বন্ধীয় ঋক্‌সমূহ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২৮ তম সূক্তে দেখি এবং শুনঃশেপের বন্ধনমুক্তির ঋক্‌সমূহ ৩০ তম সূক্তের শেষে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ অনেকগুলি শৌনঃশেপ মন্ত্রেই পাপ হইতে মুক্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমাদেরও মনে সন্দেহ হয় যে, ইতিপূর্ব্বে যে ঋকমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে "ত্রিষু দ্রুপদেষু" শব্দের অর্থে সত্যসত্যই তিনটী কাষ্ঠদণ্ড বুঝাইবে অথবা রূপকচ্ছলে কায়মনোবাক্যের ত্রিদণ্ড বুঝাইবে? আমরা অবশ্য নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না যে কায়মনোবাক্যের ত্রিদণ্ড বুঝাইবেই—আমরা কেবল একটী ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। কোন্ অর্থ নিশ্চয় বুঝাইতে পারে, সে বিষয়ে কোন বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইলে পরম উপকৃত হইব। আমরা আপাততঃ মহামতি সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে ঋগ্বেদোক্ত ঐ সকল মন্ত্র হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক শুনঃশেপের বন্ধন বিষয়কই বটে।

উদ্যোগ করিতেছিলেন। † এই আখ্যানে দেখিতে পাই যে, বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে প্রধান হোতৃপদে অভিষিক্ত আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ব্রহ্মাপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই; আবার শুনঃশেপ তাঁহাকে দুই এক স্থলে 'রাজপুত্র', "ভরত-ঋষভ" প্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত বাক্যেও সম্বোধন করিতেছেন। ইহাতেই বুঝিতেছি যে, তখনও বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়কুলোৎপত্তি ব্রাহ্মণেরা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই; তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে দু একটী ভিন্ন ব্রাহ্মণোচিত সকল কর্ম্মে অধিকার প্রদান করিলেও তখন অবধি ক্ষত্রিয়োচিত সম্বোধনে আহ্বান করা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই, এবং বিশ্বামিত্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য পূর্ব্বক সমগ্র আখ্যানটী পড়িয়া আমাদের প্রতীতি হয় যে, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের প্রতি ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টার জন্য তখন অত্যন্ত জাতক্রোধ ছিলেন —অজীগর্ত্ত যখন তাঁহার পুত্র প্রতিপ্রদানের

---

† অধ্যাপক মোক্ষমুলর লিখিয়াছেন যে এই সময়ে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহা যে ঠিক নহে, তাহা বাল্মীকিপ্রোক্ত বিশ্বামিত্রের চরিতাখ্যানেই (রামায়ণ আদি, ৫৭।৫৮ সর্গ দেখ) দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রার্থনা করেন, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র তাহাতে বাধা দেওয়াতে ঐতরেয় ঋষি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা কিছু বিরক্ত হইয়া, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রতাপে ভীত হইয়া গম্ভীর-নীরব ছিলেন। ‡

ক্ষত্রিয়দিগের উপর ব্রাহ্মণদিগের এই বিদ্বেষভাব সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই, ইত্যবসরে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, হরিশ্চন্দ্র যখন শুনঃশেপকে যজ্ঞীয় পশুরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন বরুণরাজার (অর্থাৎ ভগবানের) নিকটে রাজসূয় যজ্ঞ করিবারই "আদেশ" প্রাপ্ত হইলেন; অর্থাৎ এই সময়ে তাঁহার রাজসূয় অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প স্থির হইল। রাজসূয় যজ্ঞ অতিশ্রেষ্ঠ

---

‡ মনুসংহিতায় অজীগর্ত্তের নির্দ্দোষিতা উল্লেখ করিয়া যে শ্লোক আছে, তাহাতেও বোধ হয় যে, বিশ্বামিত্রের এই কার্য্যে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট ছিলেন না—বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্তকে দোষী বলায় যেন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র খুব সম্ভবতঃ আমরা মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকে প্রাপ্ত হই।

যজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইত; ইহার আয়োজন অতি বিপুলরূপে সংগৃহীত হইত; এবং এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিলে অনুষ্ঠাতা ইন্দ্রতুল্য মর্য্যাদা এবং অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানের সংকল্প এক দিনে যে স্থির হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এবং যে অনুষ্ঠানে ক্ষত্রিয়গণ ক্ষণকালের জন্যও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহার জন্য অধিকতর উত্তেজিত হইতে পারিতেন, হরিশ্চন্দ্র সেই অনুষ্ঠান করিতে যাওয়াতে নারদপ্রমুখ ব্রাহ্মণ ঋষিগণ যে তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে পারেন, তাহা অনুমান করিবার জন্য বোধ হয় আমাদিগকে অতিরিক্ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। আমাদের বিশ্বাস যে, হরিশ্চন্দ্র রোহিতের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা কিছু বিরক্ত বা আশঙ্কিত হইয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অংশে (৭ম, ১৯) রাজসূয় যজ্ঞের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই অংশ দেখিলেই আমাদের এইরূপ বিশ্বাসের কারণ বুঝা যাইবে। সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ

আছে যে এই রাজসূয় যজ্ঞ লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রি-য়ের পরস্পরের মধ্যে মহান্ বিরোধ ঘটিয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা স্থূল ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা জয়লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণদিগেরই জয়লাভ হইল। কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে যজ্ঞফল হইতে একেবারে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। স্থির হইল যে, ক্ষত্রিয়েরা নিজে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের দ্বারা করাইতে পারি-বেন। কেবল তাহাই নহে, যখন ক্ষত্রিয় রাজা যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষিত হইবেন, তখন তাঁহাকে সম্মত হইতে হইবে যে, কোনরূপে তিনি ব্রাহ্ম-ণের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মানমর্য্যাদা, ধন, আয়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্ব, এমন কি সন্তানসন্ততি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইহার অধিক আরও স্থির হইল যে, ক্ষত্রিয় রাজন্য যতক্ষণ অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবেন, ততক্ষণমাত্র তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে, কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হইলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণের নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব পুনর্গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিবরণ দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের রাজর্ষিত্ব লাভের

কিছু পরেই হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করায়, বিশেষতঃ যে অনুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রধান হোতৃপদ তদানীন্তন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকেই দিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল তাহাতে যে, নারদপ্রমুখ ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের বিরক্তি ও ক্রোধ হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কিছুমাত্র অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার উপর বাল্মীকিপ্রোক্ত বিশ্বামিত্র-সম্পর্কীয় পূর্ব্ব ঘটনাগুলি আমাদের এই প্রকার প্রতীতির সপক্ষে গুরুতর সাক্ষ্য দান করিবে। হরিশ্চন্দ্রপিতা ত্রিশঙ্কুর সমকালে বিশ্বামিত্র কোন প্রদেশের প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অবশেষে বসিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মবিদ্যা যে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা, বসিষ্ঠ তাহা বিশ্বামিত্রকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তখন বিশ্বামিত্রের ব্রহ্ম-বিদ্যা আয়ত্ত করিবার অভিলাষ জন্মিল। তিনি বসিষ্ঠের নিকটে রাশি রাশি ধনরত্নের বিনিময়ে সেই ব্রহ্মবিদ্যা ক্রয় করিবার বাসনা জানাইলেন। বসিষ্ঠ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে তিনি বল-পূর্ব্বক তাহা অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। রাজসূয় যজ্ঞ লইয়া একবার ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের

বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল ; আবার এই সূত্রে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ পুনঃ জাগ্রত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মণেরা শক, যবন, হূন প্রভৃতি বর্বর জাতিদিগের সহায়-তায় বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করিতে পারিল। অবশেষে তিনি তপস্যা বা কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রাহ্মণত্ব লাভের যত্ন করিয়া সর্ব্বপ্রথম রাজর্ষিত্ব লাভ করিলেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তপস্যার উদ্যোগ করি-তেছেন, এমন সময়ে হরিশ্চন্দ্রপিতা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলাভের ইচ্ছাতে কুলপুরোহিত বসিষ্ঠের নিকট যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বোধ হয়, বিশ্বামিত্রের কারণে ক্ষত্রিয়দিগের উপর ঘোরতর ক্রোধ সঞ্জাত হওয়ায় বসিষ্ঠ "তাহা হইবার নহে" বলিয়া ত্রিশঙ্কুকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ত্রিশঙ্কু বসিষ্ঠের নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে তাঁহার পুত্রগণের নিকটে সেই প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হইবার অভিশাপ প্রদান করিলেন অথবা তাঁহাকে 'একঘরে' করিলেন। অগত্যা ত্রিশঙ্কু রাজর্ষি

বিশ্বামিত্রের নিকটে গিয়া সেই প্রস্তাব করিলেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। বসিষ্ঠ-পুত্রেরা এই যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না আসাতে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে মুষ্টিক (ডোম) হইবার অভিশাপ দিয়া 'একঘরে' করিয়া ফেলি-লেন। এই স্থলে দেখি যে বিশ্বামিত্রের হোতৃত্ব করিবার অধিকার হয় নাই—তিনি এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর নিম্নপদে বরিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-ণেরা দেবতাদিগের সাহায্যে এই যজ্ঞের ইষ্টফল বিষয়ে বিশ্বামিত্রকে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই। এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, ইত্য-বসরে ত্রিশঙ্কু পরলোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব লাভ করিয়া রাজ-সূয় যজ্ঞের সংকল্প করিলেন। ব্রহ্মণেরা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র কোন শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিবেন, আর বাস্তবিকও তিনি শ্রেষ্ঠ হোতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন; এই অবস্থায় ক্ষত্রিয়দিগের উপর ব্রাহ্মণদিগের ক্রোধ ও বিরক্তি পুনঃ সন্দীপিত হওয়াই সম্ভব।

যাই হোক্, আমাদের অনুমান হয় যে, হরিশ্চন্দ্র নারদ প্রভৃতির নিকটে রাজসূয় অনুষ্ঠা-

মের সঙ্কল্প প্রকাশ করাতে তাঁহারা তাঁহাকে যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁহার নবজাত পুত্র বলিদান করিতে পরামর্শ দিয়া কোন প্রকারে সম্মত করাইতে পারিয়াছিলেন; অথবা এই যজ্ঞ করিলে তাঁহার নবজাত পুত্রকে হত্যা করিয়া বংশলোপ করিবেন, হরিশ্চন্দ্রকে ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাও অনুমান হয়। হরিশ্চন্দ্র স্বাভাবিক পুত্রবাৎসল্য বশত রাজসূয় স্থগিত রাখিয়া রোহিতকে রক্ষা করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে, যখন তিনি বরুণরাজার (অর্থাৎ বরুণরাজার হইয়া নারদপ্রমুখ যে সকল ব্রাহ্মণ রোহিতের বলিদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের) অনুরোধ এড়াইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না; অথবা যখন তিনি দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া তাঁহার যৌবনারূঢ় পুত্রবধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন, তখন তিনি রোহিতেকে ডাকিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহাকে যজ্ঞক্ষেত্রের পশু হইয়া নিহত হইতে হইবে; এই সূত্রে পূর্ব্বাহ্লেই হরিশ্চন্দ্র যে স্বীয়পুত্রকে পলায়নের পরামর্শ দেন নাই, একথা কে বলিতে পারে? আর, রোহিতেরও তখন "বর্ম্মধারণের"

উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, সুতরাং তিনিই বা সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কেন? তিনি এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগকে প্রবল দেখিয়া, ধনুর্ব্বাণমাত্র সহায় করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেন। এই বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের নিশ্চয় সহায়তা ছিল, অন্যথা তাঁহার প্রতি রোহিতের ভক্তি থাকিতে পারিত না—শুনঃশেপেই আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। কিন্তু রোহিতের পিতৃভক্তি অব্যাহত ছিল, পিতার উদরী হওয়াতে তাঁহার গৃহাগমন-চেষ্টাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

আখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে হরিশ্চন্দ্রের উদরী হওয়াতে রোহিত তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-বেশে উপস্থিত হইয়া অরণ্য পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে রোহিত পঞ্চ সুদীর্ঘ বৎসর অরণ্যেই যাপন করিলেন। বোধ হয়, কতকগুলি ব্রাহ্মণ রোহিতের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা হয়ত গ্রামের সংবাদ আনিয়া রোহিতকে প্রদান করিতেন। অনুমান হয় যে, যতদিন ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন সেই দলস্থ ব্রাহ্মণেরা রোহিতকে গ্রামে যাইতে নিষেধ

করিতেছিলেন—বোধ হয় তথায় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। অবশেষে ষষ্ঠ বৎসরে যখন রোহিত ঋষিপুত্র শুনঃশেপকে প্রাপ্ত হইলেন (তখন বোধ হয় হরিশ্চন্দ্রের অনেক বন্ধু লাভও হইয়াছিল এবং রোহিত সম্ভবতঃ গ্রামের এই সকল সংবাদও পাইয়া থাকিবেন), তখন তিনি মহানন্দে পিতৃসমীপে আসিয়া তাহা নিবেদন করিলেন। হরিশ্চন্দ্রও তাহা বরুণ রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন অর্থাৎ নিজে এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলেন।

অবশেষে যখন হরিশ্চন্দ্র বরুণরাজার 'আদেশ' অথবা নিজের মনে সায় পাইলেন যে বলির জন্য ক্ষত্রিয়পুত্র রোহিত অপেক্ষা ব্রাহ্মণপুত্র, বিশেষত ঋষিপুত্র শুনঃশেপ অধিকতর দেবপ্রিয় অর্থাৎ যখন তিনি ভাবিলেন বোধ হয় যে, মরিতে গেলে তাঁহার বীরপুত্র আপেক্ষা বামুনের ছেলেরই মরা ভাল এবং তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তিও চরিতার্থ হইবে, তখন তিনি শুনঃশেপকেই যজ্ঞস্থলে যজ্ঞীয় পশুর পরিবর্ত্তে রক্ষা করিলেন। তখন হয়ত ব্রাহ্মণদিগের চৈতন্য হইয়াছিল—তাঁহারা দেখিলেন, হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ইহার বিরুদ্ধে নরবলি

ইত্যাদিরূপ কোনই আপত্তি করিতে পারিতে-ছিলেন না, কারণ তাঁহারাই এক সময়ে রোহিতের বলিদান প্রশস্ত বলিয়াছেন। আর এখন নরবলি বলিয়া আপত্তি করিলে হরিশ্চন্দ্রই বা শুনিবেন কেন? হরিশ্চন্দ্র ব্রহ্মহত্যারও আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না, কারণ শুনঃশেপকে মূল্য দিয়া ক্রয় করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণেরা হরিশ্চ-ন্দ্রকে কৌশলে জব্দ করিবার জন্য শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন—যূপ-কাষ্ঠে বদ্ধ না করিলেও বলির জন্য বধ করা যাইবে না। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না বোধ হয় যে অর্থলোভে মনুষ্য সকল কুকর্ম্মই করিতে পারে। তাঁহারা অবাক্ হইলেন যে শুনঃশেপের পিতা স্বয়ং একশত গাভীর লোভে তাঁহাকে বদ্ধ করিতে স্বীকার করিলেন। তখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের কেহই ঘাতুকের কর্ম্ম করিবেন না। হায়! অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। তাঁহারা যেমন রোহিতকে বলিদানের প্রস্তাব কালে ভাবিতে পারেন নাই যে কোন ব্রাহ্মণ ঋষি অর্থলোভে তাঁহার পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারেন, সেইরূপ ইহাও তাঁহাদের চিন্তার অতীত ছিল যে, ব্রাহ্মণ ঋষি অর্থলোভে তাঁহার পুত্রের ঘাতুকেরও

কর্ম্ম করিতে পারেন। অজীগর্ত্ত স্বয়ং ঘাতু-
কের কর্ম্ম করিতে উদ্যত। এই সময়ে বোধ
হয় যে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উদ্ধারের জন্য পরামর্শ
করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ যখন শুনঃশেপ
অঞ্জঃসব আসব অবিষ্কার করিলেন এবং যখন
তিনি অতি সুন্দর ঋক্‌মন্ত্রসমূহ দ্বারা দেবস্তুতি
করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন
যে, এই ঋষিবালক সামান্য বালক নহে, নিজেও
একজন ঋক্‌দ্রষ্টা ঋষি, এবং তখন তাঁহারা, বোধ
হয়, এই অসামান্য ঋষিবালকের জীবন রক্ষা
অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। আমাদের
অনুমান হয় যে, তাঁহারা এখন বিপদ গণিয়া
রাজা হরিশ্চন্দ্রকে নানা প্রকারে বুঝাইতে সক্ষম
হইয়াছিলেন যে, এমন অসাধারণ ব্যক্তিকে বলি-
দান করা সঙ্গত নহে; হয়ত ইহাও বুঝাইয়া-
ছিলেন যে, আর কোন প্রকার নরবলি দেওয়া
হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে সোম প্রভৃতি বলি
দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে; সম্ভবত হরিশ্চন্দ্রকে এই-
রূপ বুঝাইয়া দেওয়াতে তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইল
এবং তিনি শুনঃশেপের পাশমুক্তি বিধান করি-
লেন। আখ্যানে আমরা দেখি যে শুনঃশেপের
দেবস্তুতি যেই শেষ হইয়া গেল, অমনি তাঁহার

বন্ধনপাশ মুক্ত হইয়া গেল, জীববলির পরিবর্ত্তে সোমবলি দেওয়া হইল এবং (সম্ভবত তাঁহার মনের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করাতে) হরিশ্চন্দ্রের রোগও ভাল হইয়া গেল।

শুনঃশেপের এই বন্ধনমোচনে বোধ হয় বিশ্বামিত্র খুব সহায়তা করিয়াছিলেন; আমরা দেখি যে তিনি বন্ধনমুক্ত হইলে প্রথমেই বিশ্বা-মিত্রের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং এবং তাঁহারই পুত্রস্থানীয় হইবার ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহার পিতা পুত্রের এত গুণ দেখিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে শতগাভী প্রাপ্তির প্রলোভন সত্ত্বেও শুনঃশেপ তাঁহার ঘাতুককল্প পিতার নিকটে যাইতে স্বীকার করিলেন না। বিশ্বামিত্রও তাঁহাকে তাঁহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিয়া, উদার-ভাবে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রের সমুদয় অধিকার প্রদান করিয়া আপনার "দেবরাত" বা দেবদত্ত পুত্র বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্রের বিশেষ একটী লাভ হইল। শুনঃ-শেপের ন্যায় উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ঋষি যখন তাঁহার পুত্র হইলেন, তখন তাঁহার নিজের ব্রাহ্মণত্বও

ঐ খানেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং শুনঃশেপকে সেই ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র পাইলেন। এইরূপ আলোচনা দ্বারা আমাদের ধারণা হইয়াছে যে এই শৌনঃশেপাখ্যানের অথবা ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার মূলসূত্র ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ।

এই শৌনঃশেপাখ্যান পাঠ করিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই মত প্রচার করেন যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হইবার সময় যজ্ঞার্থে নরবলি প্রচলিত ছিল। আমাদের বিশ্বাস যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময়েই যে নরবলি অপ্রচলিত ছিল তাহা নহে; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই আখ্যানে যে বৈদিক সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সে সময়েও তাহা প্রচলিত ছিল না। এক সময়ে আর্য্যদিগের মধ্যে যে নরবলি একটা প্রচলিত প্রথা ছিল, তাহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু ধ্যানপরায়ণ আর্য্যজাতি তাহার দোষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচিত হইবার বহুপূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদের ন্যায় এত হীনবীর্য্য ছিলেন না যে, প্রচলিত কোন প্রথার দোষ দেখিয়ামাত্র নীরব থাকিবেন, সংশোধনের চেষ্টা করিবেন না। তাঁহারা দোষ

দেখিয়া নরবলি প্রথা এবং ক্রমে ক্রমে যজ্ঞার্থে জীবহিংসা পর্য্যন্ত রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্রীহি প্রভৃতি বলি দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হইবার এত কাল পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, ঐতরেয় ঋষি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে "দেবতারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন"; অর্থাৎ তিনি বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, যদিও বহুকালের ব্যবধান বশতঃ এই বিধিপ্রবর্ত্তকদিগের নামধাম জানা অসম্ভব, কিন্তু তাঁহারা যে দেবহৃদয়, সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই (২ পং, ৮)।

দ্বিতীয়তঃ, যদি নরবলি প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে তদ্বিষয়ে নূতন করিয়া নারদের পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক হইত না। তৃতীয়তঃ, অজীগর্ত্ত শস্ত্রহস্তে পুত্রসমীপে আসিবার পূর্ব্বে শুনঃশেপের বিশ্বাসই হয় নাই যে, সত্য সত্য তাঁহাকে বলি দেওয়া হইবে; পরে যখন তাহা বুঝিলেন, তখন দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন, এইরূপ ভাবের কথা আখ্যানে উল্লিখিত আছে। যদি নরবলি প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে শুনঃশেপের বধ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াও এরূপ অবিশ্বাস আসিতে পারিত না। নরবলি চলিত

থাকিলে ব্রাহ্মণ হইলেও অরণ্যনিবাসী অজ্ঞাত-কুলশীল এক ব্যক্তিকে হনন করিবার জন্য ঘাতুকের অভাব হইত না—একমাত্র তাঁহার পিতা অর্থলোভে পড়িয়াই তাদৃশ নিষ্ঠুর কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক ঋষি যে পুত্রবধ-রূপ কুকর্ম্মে উদ্যত হইতে পারেন এবং তাহা যে অত্যন্ত ঘৃণিত, তাহা দেখাইবার জন্যই যেন ঐতরেয় ঋষি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং কুকর্ম্মের জন্য অজীগর্ত্ত তাঁহার পুত্র ও বিশ্বামিত্রের নিকট কিরূপ তীব্র তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সকল কারণে আমরা একটা নরবলির উদ্যাগ দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে পারি না যে তখন নরবলি দেওয়া একটী প্রচলিত প্রথা ছিল। ভীম ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ দুঃশাসনকে বধ করিয়া রক্ত পান করিয়া-ছিলেন। তাহা হইতে কি আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ যে মহা-ভারতের সময়ে অথবা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্যকালে শত্রুর বুক চিরিয়া রক্তপান করা প্রচলিত প্রথা ছিল?

এই শৌনঃশেপ আখ্যান উপলক্ষে পণ্ডিত মোক্ষমূলের একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে অজীগর্ত্ত ঋষি আর্য্য বা অনার্য্য ? * তাঁহার মতে অজীগর্ত্ত হয় অনার্য্য বা শূদ্র ছিলেন ; অথবা যদি ইহা স্থির হয় যে তিনি আর্য্য ছিলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তখন এমন এক সম্প্রদায় আর্য্য ছিলেন, যাঁহারা আপনাদের পুত্র বিক্রয় করিতে ও তাহাদিগের হননকার্য্যে পর্য্যন্ত উদ্যত হইতে পারিতেন ; তাঁহারা হয়ত অন্যান্য আর্য্যদিগের সঙ্গে আসেন নাই, পৃথক্ আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি। আমাদের মনে কিন্তু এ সকল কথার কোনটাই সায় পায় না। আমাদের ধারণা এই যে, অজীগর্ত্ত প্রকৃতই একজন ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন ; কিন্তু তিনি সপরিবারে বহুকাল যাবৎ বনবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নাম দেখিলেই অনুমিত হইতে পারে যে, তিনি নগরগ্রামের মুখ বহুকাল যাবৎ দেখেন নাই—পুত্রত্রয়ের নাম, শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ এবং শুনোলাঙ্গূল ; যেন মনুষ্য অপেক্ষা কুক্কুরাদির সহিত তাঁহার অধিকতর পরিচয় ছিল। কিন্তু

---

* His. of Ancient Sans. Literature.

তাহার পরে যখন তিনি একশত গাভী প্রাপ্ত হইলেন, তখন ক্রমশ তাঁহার লোভ বাড়িয়া গেল এবং সেই লোভে পড়িয়াই তিনি পুত্রবধরূপ কুকর্ম্মে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া তাঁহাকে অনার্য্য কল্পনা করিবারও প্রয়োজন নাই এবং ইহাও বলা সঙ্গত নহে যে, একদল আর্য্য ছিলেন, যাঁহাদের হৃদয় পুত্রবিক্রয় অথবা পুত্র-হননকার্য্যে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না। অজী-গর্ত্ত যে অনার্য্য ছিলেন না, শুনঃশেপের উক্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। শুনঃশেপ যখন বলিতে-ছেন যে 'শূদ্রেরও হস্তে পুত্রবধে উদ্যত অস্ত্র দেখা যায় না, কিন্তু তোমার হস্তে তাহা দেখা গিয়াছে'—ইহাতেই কি সপ্রমাণ হয় না যে অজী-গর্ত্ত শূদ্র বা অনার্য্য ছিলেন না। আর, যদি কোন সাধু খৃষ্টান দৈবাৎ মোহবশতঃ খৃষ্টের কোন একটী অনুজ্ঞা অমান্য করেন, তাহা হই-লেই তাঁহাকে একেবারে অখৃষ্টান বলাও সঙ্গত নহে এবং তাঁহার একটী দৃষ্টান্তের বলে এমন বলাও কি সঙ্গত যে, একদল ভদ্র খৃষ্টান খৃষ্টের সেই অনুজ্ঞা পালন করেন না? তাহা কখনই হইতে পারে না।

যাই হউক, শুনঃশেপের বিক্রয় প্রভৃতি

অজীগর্ত্ত ও মনুসংহিতা।

কার্য্যে তাঁহার পিতা অজীগর্ত্ত যে গুরুতর অন্যায় করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতরেয় ঋষি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে অজীগর্ত্ত নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিয়া যথেষ্ট পশ্চাত্তাপ এবং নিজের কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু মনুসংহিতা, কি জানি কেন, অজীগর্ত্তের কার্য্যকে দোষশূন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় আছে—

"অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পদ্বুভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥"

১০ম; ১০৫

"অজীগর্ত্ত বুভুক্ষিত হইয়া পুত্রকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন; ক্ষুৎপ্রতীকারার্থে এরূপ আচরণ করিলেও পাপলিপ্ত হয়েন নাই।" মনুসংহিতার এরূপ কথা বলা, আমাদের বোধ হয়, যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। যখন অজীগর্ত্ত নিজে অনুভব করিয়া বলিতেছেন যে এরূপ কর্ম্মে তাঁহার পাপ হইয়াছে, তখন তাঁহার যে পাপ হয় নাই, অপরের মুখের এরূপ কথা গ্রাহ্য হইবে কেন? আর একটী কথা এই যে,

মনু এস্থলে বলিতেছেন যে, দুর্ভিক্ষাদির সময় ক্ষুধায় দিশাহারা হইয়া পুত্রবধার্থে উদ্যত হইলেও কোন দোষ হয় না। না হয়, তাহা আমরা স্বীকার করিলাম। কিন্তু অজীগর্ত্তকে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে আনয়ন করা আমরা অনুমোদন করিতে পাঁরি না। অবশ্য অজীগর্ত্ত সর্ব্বপ্রথমে করাল অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই একশত গাভীর বিনিময়ে পুত্র শুনঃশেপকে বিক্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরে যে দুই শত গাভীর বিনিময়ে পুত্রকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ও তাঁহাকে হনন করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাও কি অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য—কখনই নহে, তাহা অর্থপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এই অবস্থায় মনু যে কি কারণে অজীগর্ত্তকে পাপশূন্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

একটী কথা এই যে, হয়তো উক্ত শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত? আমরা কিন্তু সে কথায় সায় দিতে পারিতেছি না। জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইলে কতকগুলি কার্য্য যে দোষাবহ হয় না, এই বিষয়ের উপদেশ এবং তৎসঙ্গে অজীগর্ত্তের দৃষ্টান্ত এত প্রাসঙ্গিক ও স্বাভাবিক ভাবে আসিয়াছে

ও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, মনুসংহিতার এই অংশটী বারম্বার আলোচনা করিয়াও আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না যে উক্ত শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত।

আমাদের মীমাংসা এই যে, মনু অজীগর্ত্তের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলরের ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরও নিকটে এই মীমাংসায় সায় পাই। মনু যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যান জানিতেন না তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে তিনি ঐ একটী শ্লোকের মধ্যে সমুদয় আখ্যানের স্থূল কথা সন্নিবিষ্ট করিতে পারিতেন না। আর মনুসংহিতার রচয়িতার ন্যায় মহাপুরুষকে বৈদিক বিষয়ে অজ্ঞ বলিতে, আশা করি, আমাদিগের মধ্যে কেহই সাহস করিবেন না। সুতরাং মনু যে অজীগর্ত্তের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমরা আর সন্দেহ করিতে পারি না। তাঁহার এরূপ চেষ্টা করিবার যে অনেক কারণ ছিল, তাহা বুঝিতে পারি। মনু সমাজকে বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য না রাখিলে খুব. সম্ভবত সমাজকে সুশৃঙ্খলায়

আনা অসম্ভব হইত। আমাদের বোধ হয়, ব্রাহ্মণ অজীগর্ত্ত যে তাঁহার পুত্রবধে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা মনুসংহিতার সময়ে গল্পভাবে প্রচলিত ছিল—ঐতরেয়োক্ত আখ্যান লোকের মনে তত জাগ্রত ছিল না। যাহাতে অজীগর্ত্তকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা না জন্মে অথবা ব্রাহ্মণের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সাধারণ লোকের কুকর্ম্মে মতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, এই সকল মনু কর্ত্তৃক অজীগর্ত্তের দোষ ঢাকিবার উদ্দেশ্য হইতে পারে। আর একটী কারণ বোধ হয় এই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের প্রতি বিরক্ত ছিলেন; বোধ হয় বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্তকে দোষী বলায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র আমরা মনুসংহিতার এই শ্লোকে প্রাপ্ত হই। যাইহোক মনুর এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে যাওয়া নিতান্তই অযুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে।

মনুসংহিতায় এইরূপ উল্লেখ থাকাতে আর একটী বিষয় অনুমিত হইতেছে যে, মনু-

সংহিতার সময়ে বেদপাঠ প্রভৃতির বিধি থাকিলেও তখন সাঙ্গ বেদপাঠ তত প্রচলিত ছিল না; কারণ তাহা প্রচলিত থাকিলে অনেকেই বৈদিক গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সহিত মনুসংহিতার এই বিষয়ে বিরোধ দেখিতে পাইতেন। তখন তাঁহারা শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই অবলম্বনীয়, মনুসংহিতারই এই বচনানুসারে অজীগর্ত্তের যে পাপ হইয়াছিল, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কথাই মানিয়া লইতেন এবং তাহা হইলে মনুও শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্য লিখিতে সাহসী হইতেন না। মনুসংহিতার এই অংশ হইতে বুঝিতেছি যে, মনুসংহিতা ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থের ন্যূনাধিক শতবর্ষ পরে রচিত হইয়াছে, কারণ, ইহাতেও আখ্যানের সারভাগের সঙ্গে সঙ্গে অজীগর্ত্ত নামটীও অবিকৃত দেখিতে পাই।

রামায়ণে শৌনঃশেপ আখ্যান।

এইবারে আমরা বাল্মীকি-রামায়ণে আসিয়া উপনীত হইলাম (আদি, ৬১ সর্গ)। ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থের বহু পরে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, আমাদের এইরূপ অনুমান হয়। আমরা ইহাতে দেখি যে ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্র-কথা বা শৌনঃশেপাখ্যানের মূল অংশ ঠিক রাখা

হইয়াছে, কেবল আখ্যানোল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তি ও স্থানের নামধাম পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্র রাজা, বিশ্বামিত্র হোতা ও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত, হরিশ্চন্দ্র-তনয় রোহিত, অজীগর্ত্তপুত্র শুনঃশেপ রোহিত কর্ত্তৃক অরণ্যবাসকালে দৃষ্ট হয়েন এবং শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের নিকটে কোন ঋক্ শিক্ষা না করিয়া স্বয়ংই তাহা দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। রামায়ণে আছে যে, অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ করিতে গেলে ইন্দ্র কর্ত্তৃক যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছিল। পুরোহিত তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে এক নরবলি দিবার বিধি দেওয়াতে অম্বরীষ উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অবশেষে তিনি ভৃগুতুঙ্গ নামক স্থানে ভৃগুবংশীয় ঋচীকমুনিকে পত্নী ও পুত্রত্রয়ের সহিত আসীন দেখিতে পাইলেন। এইখানে সেই শৌনঃশেপ আখ্যানের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এখানে মধ্যম পুত্রের নাম শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শুনক বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। আরও দেখি যে, রামায়ণে রাজার নিকটে শুনঃশেফ ঋচীক কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বিক্রীত হন নাই। ঋচীক জ্যেষ্ঠ

পুত্রকে এবং ঋচীকপত্নী কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে অস্বীকার করায় শুনঃশেফ অভিমান-ভরে স্বয়ং রাজার নিকটে বলিলেন "হে রাজ-পুত্র! আমার পিতা বলিলেন 'জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রদান করিব না' এবং মাতা বলিলেন 'কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না' সুতরাং বোধ হইতেছে "আমি মধ্যম, আমি বিক্রেয়,' আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।" অম্বরীষ অবশ্য ঋচীককে ধনরাশি প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে শুনঃশেফকে রথে আরোহণ করাইয়া রাজধানীর অভিমুখে ফিরি-লেন। পথে পুষ্কর তীর্থ; তথায় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রকে তপস্যা করিতে দেখিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্রদিগকে তাঁহাদিগের কাহারও জীবনের বিনিময়ে শুনঃশেফের রক্ষাসাধনে আদেশ করিলেন। কিন্তু মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের তনয়েরা তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে পিতা কর্তৃক অভি-শাপগ্রস্ত হইলেন। তাহার পরে বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে আগ্নেয় মন্ত্র এবং দুইটী গাথা শিক্ষা দিয়া তাহাই তাঁহার মুক্তির উপায় বলিলেন। তদনন্তর যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া শুনঃশেফ যথা-বিধি সেই আগ্নেয় মন্ত্র ও দুই গাথাদ্বারা ইন্দ্র ও

বিষ্ণু দেবদ্বয়কে স্তব করিয়া মুক্তিলাভ করি-লেন।

রামায়ণের এই শৌনঃশেফ উপাখ্যানে দেখি-তেছি যে, বাল্মীকি এই আখ্যানের সহিত ইন্দ্র কর্ত্তৃক যজ্ঞীয় পশু হরণের একটা বৃথা কথা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ প্রক্ষেপ বা সংযোগ মূল ঘটনার অনেক পরে ব্যতীত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি নাম পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। শুনোলাঙ্গূল নাকি রামায়ণের সাময়িক সভ্যভব্য শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বড়ই কর্কশ লাগিতে পারে, অথবা হয়তো "লাঙ্গূল" শব্দের অস্তিত্বই ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাই ঋচীকের কনিষ্ঠপুত্রের শ্রুতিমধুর শুনক নাম রাখা হইল। সেইরূপ অজীগর্ত্ত বড়ই নাকি অসভ্য কর্কশ নাম, তাই তৎপরিবর্ত্তে সভ্যভব্য ঋচীক নাম রাখা হইল। সম্ভবতঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে সুদূরব্যবহিত রামায়ণের কালে অজীগর্ত্তের নাম আধস্পষ্ট আধ অস্পষ্ট ভাবে স্মরণ হইতে হইতে ঋচীক আকারই ধারণ করিয়াছিল—অজীগর্ত্ত ও ঋচীক, এই উভয় নাম শীঘ্র শীঘ্র উচ্চারণ করি-লেই উভয় নামের সৌসাদৃশ্য দেখা যাইবে। এইরূপ হরিশ্চন্দ্রের পরিবর্ত্তে অম্বরীষ স্থান পাইয়াছেন।

রামায়ণে এই সকল নামপরিবর্ত্তন এবং বিশ্বামিত্রের পুষ্করতীর্থে তপস্যা ও তথায় শুনঃ-শেফকে মন্ত্রশিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে রামায়ণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং মনুসংহিতারও অনেক পরে রচিত হইয়াছে ; রামায়ণের সময়ে লোকে মূল আখ্যান একেবারে বিস্মৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু অনেকটা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। রামায়ণের সময়েও লোকে জানিত যে শুনঃশেফ নানা দেবস্তুতি করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অঞ্জঃসব নামক আসব প্রস্তুত করা যে মুক্তি-লাভের অন্যতর হেতু ছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া-ছিল। তখনও লোকের ধারণা ছিল যে বিশ্বা-মিত্রের সহায়তায় শুনঃশেফের মুক্তিলাভ ঘটিয়া-ছিল, কিন্তু বিশ্বামিত্র যে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া এই সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল ; তৎপরিবর্ত্তে বিশ্বামিত্রের পুষ্করতীর্থে তপস্যা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ উপকথা রামায়ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তথ ও লোকদের এইটুকু স্মরণ ছিল যে, বিশ্বা-মিত্রের অবাধ্য হওয়াতে তাঁহার পুত্রগণ শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সকল পুত্রের যে এরূপ দশা

ঘটে নাই তাহা স্মরণ ছিল না, তাই সকল পুত্র-কেই এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে। রামায়ণে শুনঃশেফের অভিমান সুব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু চোরের উপর রাগ করিয়া ভূমিতে ভাত খাইবার ন্যায় পিতামাতার উপর অভিমান করিয়া বধ্যভূমিতে নীত হইবার জন্য আত্ম-সমর্পণ করা সুসঙ্গত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ভাব ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সমসময় অপেক্ষা অধিকতর সভ্যভব্য সময়েই সম্ভবে।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা রামায়ণকে পরিত্যাগ করিব। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র এবং লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ত্রিশঙ্কুর পুত্র অম্বরীষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও দেখিতেছি যে ইক্ষ্বাকু বংশীয় হরি-শ্চন্দ্রেরই সহিত শৌনঃশেপ আখ্যান সংযুক্ত এবং কোথায়ও ইক্ষ্বাকুবংশে এক হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ দেখা যায় না; মহা-ভারতেও ইহারই পরিপোষক বাক্য দেখিতে পাই —তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এই সকল কারণে শৌনঃশেপ আখ্যানের সহিত রাজা অম্বরী-ষের নাম সংযুক্ত করিয়া বাল্মীকি ভ্রমে পড়িয়া-ছেন, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।

এইবারে মহাভারতে আমরা হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে কি ঐতিহাসিক তথ্য দেখিতে পাই তাহারই আলোচনা করিয়া হরিশ্চন্দ্রকথার প্রাচীন অংশ সমাপন করিব।

মহাভারতে হরিশ্চন্দ্রকথা।

হরিশ্চন্দ্রকথাকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রাচীন ও নবীন। যে হরিশ্চন্দ্রকথায় রাজসূয়যজ্ঞ অথবা শৌনঃশেপ বিবরণের কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে, সেই-গুলি আমরা প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথা বলিয়া ধরিব এবং যেগুলিতে অন্য প্রকার বিবরণ দেখা যাইবে, সেগুলি নবীন হরিশ্চন্দ্রকথা বলিয়া ধরিব। আমরা এখনি দেখিতে পাইব যে মহাভারত পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীন কথা স্থান পাইয়াছে, মহাভারতের পরে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবধি নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার সূত্রপাত হইয়াছে এবং হরিশ্চন্দ্রের এই নবীন কথাই আজ পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির নিকটে বিশেষ সমাদর পাইতেছে।

মহাভারতের দুই তিনটী বিভিন্ন স্থলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমত সভাপর্ব্বে (১২ অধ্যায়ে) আছে যে, নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট ইন্দ্রসভার বর্ণনকালে রাজ-গণের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন অপর কাহারও

নামোল্লেখ না করাতে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে নারদ বলিলেন "সেই বলবান রাজা সমস্ত মহীশ্বর-দিগের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শাসনে সকল ভূপালেরাই অবনত হইয়াছিলেন। হে লোক-পতে! তিনি সুবর্ণ-বিভূষিত একমাত্র জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া শস্ত্রপ্রতাপে সপ্তদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! তিনি শৈল, বন ও কানন সম্বলিত সমগ্র মহীমণ্ডল জয় করিয়া রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সকল ভূপাল তাঁহার আজ্ঞানু-সারে ধনাদি আহরণ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ-দিগের পরিবেষ্টারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞকালে যাচকেরা যাহা প্রার্থনা করিয়া-ছিল, নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র প্রীতিসহকারে তাহা-দিগকে তাহার পঞ্চগুণ অতিরিক্ত ধন প্রদান করিয়াছিলেন। অথচ পূর্ণাহুতির সময় উপস্থিত হইলে তিনি নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ-গণকে অভিলাষানুরূপ নানা প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য ও বহুবিধ ধন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছি-ছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও রত্ননিকর দ্বারা তর্পিত ও সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র এইরূপ উদ্বোধন করিয়াছিলেন

যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র সকল ভূপাল অপেক্ষা অধিক-তর তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছেন। হে রাজন্! এই কারণে হরিশ্চন্দ্র সেই সহস্র সহস্র রাজন্যগণ অপেক্ষা সমধিক বিরাজমান হইতেছেন। সেই প্রতাপবান্ মহীপতি উক্ত যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইয়া-ছিলেন।"

শান্তিপর্ব্বে (২০ অধ্যায়ে) যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞানু-ষ্ঠানের জন্য উৎসাহিত করিয়া দেবস্থান ঋষি বলিতেছেন "আপনি শুনিয়া থাকিবেন, পার্থি-বেন্দ্র হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াই পুণ্যভাগী ও শোকরহিত হইয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য হইয়াও ঐশ্বর্য্যে দেবরাজকেও অতিক্রম করিয়া-ছিলেন।"

অনুশাসনপর্ব্বে (৩য় অধ্যায়) আমরা শৌনঃ-শেপ আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হই; কিন্তু এখানে শুনঃশেপকে ঋচীকপুত্র বলা হই-য়াছে এবং বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশ পুত্রেরই শাপগ্রস্ত হইবার কথা আছে। এই আখ্যানটী কুশিক-বংশের গুণকীর্ত্তন উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মর্ষিসঙ্কুল বিদ্যাবান্ অতি মহান্ কুশিকবংশ এই নরলোকে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া

স্থাপিত হইয়াছে ; ঋচীকপুত্র মহাতপা শুনঃশেপ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে আত্মপ্রভাবে সন্তুষ্ট করত মহাসত্র হইতে বিমোক্ষিত এবং ধীমান্ বিশ্বামিত্রের পুত্রতা প্রাপ্ত হয়েন (এই) জ্যেষ্ঠ নরাধিপ (বংশীয়) দেবরাতকে (দেবদত্ত বিশ্বামিত্রপুত্র শুনঃশেপকে) বিশ্বামিত্রের অন্যান্য পঞ্চাশ পুত্র অভিবাদন না করাতে শাপবশত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" *

---

* সংস্কৃত শ্লোকগুলি এই—

ঋচীকস্যাত্মজশ্চৈব শুনঃশেপো মহাতপাঃ।
বিমোক্ষিতো মহাসত্রাৎ পশুত্বমভ্যুপাগতঃ॥
হরিশ্চন্দ্রক্রতৌ দেবাংস্তোষয়িত্বাত্মতেজসা।
পুত্রতামনুসম্প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ॥
নাভিবাদয়তে জ্যেষ্ঠংদেবরাতং নরাধিপং।
পুত্রাঃ পঞ্চাশদেবাপি শপ্তাঃ শ্বপচতাং গতাঃ॥

মহাভারতের বর্দ্ধমান সংস্করণে "হরিশ্চন্দ্রঃ ক্রতৌ" এইরূপ আছে এবং "হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের পুত্র হইলেন" ইত্যাদিরূপ অদ্ভুত অনুবাদ করা হইয়াছে। তাঁহার কারণ আর কিছুই নহে—সম্পাদক ও অনুবাদকগণের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই অধীত ছিল না, সেই কারণে তাঁহারা প্রত্যেক শ্লোকের একটী কর্ত্তা ও একটী সমাপিকা ক্রিয়া রাখিতে গিয়াই এরূপ গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাই

হরিবংশ যদিও মহাভারতের ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি ইহাতেও হরিশ্চন্দ্র বিষয়ক যাহা পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ এইখানেই করিয়া রাখা ভাল। হরিবংশে (১৩ অধ্যায়ে) আছে—"সর্ব্বশক্তিমান্ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দেবগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠের সাক্ষাতে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করাইলেন, ত্রিশঙ্কুর সত্যরথা নামে কেকয়বংশজা ভার্য্যা ছিলেন। সেই ভার্য্যাতে তিনি হরিশ্চন্দ্র নামক নিষ্পাপ কুমারের জন্মদান করেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্রিশঙ্কুর পুত্র বলিয়া ত্রৈশঙ্কব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হন ; হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত অতিশয় বীর্য্যবান্ ছিলেন; তিনি রাজ্যের উন্নতি করিবার কারণ এই রোহিতপুর নামক নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই রাজর্ষি রোহিত রাজ্য ও প্রজাবর্গকে যথাবৎ পালন করিয়া সংসারের অসারতা জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সেই নগর সম্প্রদান করেন।"

আমরা "হরিশ্চন্দ্রঃ" শব্দের বিসর্গ উঠাইয়া দিয়া "ক্রতৌ" শব্দের সহিত তাহার সমাস করিয়া তদনুরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি। এইখানে দেখা যাইবে যে সংস্কৃত ভাষায় একটী অক্ষরের বিপর্য্যয়ে কিরূপ অর্থ বিপর্য্যয় ঘটে।

মহাভারতোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হইতে আমরা ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্রকথারই বিশেষ পোষকতা প্রাপ্ত হইতেছি—দুএকটী স্থান সামান্য বিভিন্ন দেখি। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র যে রোহিত, তদ্বিষয়ে মহাভারত ও হরিবংশ উভয়েতেই সায় পাইতেছি। বিষ্ণুপুরাণে রোহিতাশ্ব বলিয়া উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ তাহা হইতেই এই নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণে এবং নবীন হরিশ্চন্দ্রকথা-সম্বলিত অন্যান্য আধুনিক গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে। ইহা অতি সামান্য প্রভেদ, ধর্ত্তব্য নহে। রামায়ণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার আলোচনাকালে বলিয়া আসিয়াছি যে রামায়ণে শৌনঃশেপ আখ্যানের সহিত রাজা অম্বরীষের নাম সংযুক্ত এবং লিঙ্গপুরাণে ত্রিশঙ্কুর পুত্র অম্বরীষ, এরূপ উল্লেখ থাকিলেও আমরা বিষ্ণুপুরাণের সমর্থনে এবং মহাভারতের পোষকতায় হরিশ্চন্দ্রকেই ত্রিশঙ্কুর পুত্র ও শৌনঃশেপাখ্যানের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহার উপর যখন হরিবংশেও এই বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতেছি, তখন এবিষয়ে অধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করা শ্রেয় নহে বিবেচনা করি। রামায়-

ণের ন্যায় মহাভারতেরও বর্ণনা হইতে দেখিতেছি যে, অজীগর্ত্তের নাম, কি জানি কেন, মনুসংহিতার পর হইতেই বিস্মৃত হইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঋচীক নাম আনীত হইয়াছে। আরও দেখিতেছি যে, মহাভারতের সময়ে বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বসাধারণের নিকটে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহাভারত পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি হরিশ্চন্দ্রকথা পাইয়াছি, সকলেরই মূল অংশ দেখি ঐতরেয়োক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান। এই পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক হরিশ্চন্দ্রকথা দেখিতে পাই। ঐতরেয়োক্ত এই প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথার প্রত্যেক চরিত্রে কেমন এক বীরত্বের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়—যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহা অনেকটা অবিকৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই বৈদিক আখ্যানে এই বীরত্বের ছবি থাকিয়া গিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, রোহিত, বিশ্বামিত্র, শুনঃশেপ প্রভৃতি সকলেরই চিত্র অতি স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাই আমরা এই শৌনঃশেপাখ্যানে সেই অতি পুরাকালের আর্য্যজাতির ক্ষত্রিয়বীরত্ব এবং

ব্রাহ্মণপ্রাধান্য, উভয়ই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছি।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথা উপসংহার করিব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অংশে এই শৌনঃশেপ আখ্যান বা হরিশ্চন্দ্র-কথা রহিয়াছে, সেই অংশেই (৮পং, ২১ ইত্যাদি) পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়, দুষ্মন্তপুত্র ভরত প্রভৃতি অনেক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। বোধ হয়, এই কারণে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ "অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিবেচনা করেন।"* আমাদের তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। দুষ্মন্তপুত্র ভরত কিছু মহাভারতের সমসাময়িক লোক ছিলেন না; বরঞ্চ মহাভারতেই দেখি যে মহাভারতের সময়ে দুষ্মন্ত হইতে ভরতোৎপত্তি যেন বহুপূর্ব্বাবধি প্রচলিত একটী উপাখ্যান ছিল। সুতরাং এই ভরতের কথা থাকাতেই আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই অংশকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিবার কোনই প্রয়োজন দেখিনা। অবিক্ষিৎতনয় মরুত্ত প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল রাজার কথা সেই অংশে উল্লিখিত

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় সম্পাদিত "হিন্দু-শাস্ত্র" প্রথম খণ্ড দেখ।

হইয়াছে, তাঁহাদেরও অনেকের কথা মহা-ভারতে পুরাকালীন ইতিবৃত্তরূপে উল্লিখিত হই-য়াছে; সুতরাং তাঁহাদের কথা থাকিলেও আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই অংশকে “অপেক্ষাকৃত আধুনিক” বলিবার হেতু দেখিতে পাই না।

তবে সেই অংশকে আধুনিক সন্দেহ করিবার পক্ষে একটী কথা দেখিতে পাই—তাহা “পারি-ক্ষিৎ জনমেজয়।” এই শব্দটী দেখিলেই সন্দেহ হয় বটে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অংশে এই শব্দদ্বয় পাওয়া যায়, সেই অংশটী বুঝি অভিমন্যুপৌত্র ও পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের রাজ্যাধিষ্ঠানের পর এবং অন্ততঃ কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের পর লিখিত হইয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে পাশ্চত্য পণ্ডিতেরা এই পারিক্ষিৎ ও পরিক্ষিত-তনয় জনমেজয়ের নাম দেখিয়া এই অংশকে আধুনিক বলিয়া ভ্রম করি-য়াছেন। ইহাতে আমরা কিছু আশ্চর্য্য হই নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি মহাভারতটী ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদিগকে এই ভ্রমে পড়িতে হইত না। মহা-ভারতেই (শান্তি, ১৫০ অ) আমরা দেখিতে পাই যে, মহাভারত-রচনার অথবা কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের

বহুকাল পূর্ব্বে জনমেজয় নামে এক রাজা ছিলেন এবং তাঁহারও পিতার নাম দুর্ভাগ্যক্রমে পরিক্ষিৎ ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠি-রের কোন প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন "শুনকতনয় দ্বিজবর ইন্দ্রোত যাহা জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন, আমি এই বিষয়ে তোমার নিকটে সেই ঋষিগণসংস্তুত পুরাতন বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয় নামা মহাবলপরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন" ইত্যাদি। সুতরাং দেখিতেছি যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই শৌনঃশেপ আখ্যান-সম্বলিত অংশকে আধুনিক বলিয়া মনে করি-বার কোনই কারণ নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডি-তেরা অধিকাংশ স্থলে ভ্রমাত্মক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের শাস্ত্র সমূহকে কোন গতিকে ন্যূনাধিক পাঁচটী হাজার বৎসরের অন্তর্বর্ত্তী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং আমরাও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। এই খানে আমরা প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথার উপসংহার করি-লাম।

এই বারে আমরা নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার অলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মার্কণ্ডেয় পুরাণ

হইতেই যে এই নবীন কথার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়া রাখিয়াছি। কএকটী নাম ব্যতীত এই নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার সহিত প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথার কোন অংশেই সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত (৭ম অধ্যায়ে) উপাখ্যানটী আলোচনা করিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। সেই পৌরাণিক উপাখ্যানটী এই—"ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামক এক রাজর্ষি ছিলেন; তাঁহার রাজ্যকালে রাজ্য-মধ্যে ব্যাধি, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কোন প্রকার অমঙ্গল প্রবেশ করিতে পারিত না। এক-দিন তিনি মৃগয়াতে বহির্গত হইয়া এক অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে বিশ্বামিত্র সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপী ও স্ত্রীমূর্ত্তিধারী বিদ্যাত্রয়ের সাধনা করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্রকে এই বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহারা আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। সেই আর্ত্তনাদ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি বিঘ্নরাট-প্রেরিত হইয়া অভয় প্রদান করিতে করিতে সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই শব্দের অনুসরণ করিয়া অবশেষে স্ত্রীমূর্ত্তি-

মার্কণ্ডেয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্রকথা।

ধারা বিদ্যাত্রয়কে দেখিতে পাইলেন, নিকটে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বিদ্যাত্রয়কে সামান্য মানবী ভাবিয়া এবং তাঁহাদিগকে নিশ্চয় কেহ যন্ত্রণা দিতেছিল এই-রূপ স্থির করিয়া যন্ত্রণাদাতার উদ্দেশে নানা ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কোথায়ও অন্তরালে ছিলেন; তিনি হরিশ্চন্দ্রের এই সকল বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং এই ক্রোধবশত বিদ্যা-ত্রয়ও বিশ্বামিত্রের নিকট চিরবিদায় লইলেন। হরিশ্চন্দ্র ক্রোধপ্রজ্জলিত বিশ্বামিত্র মুনিকে দেখিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু বিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্নি কিছুতেই প্রশমিত হইল না। তিনি অবশেষে হরিশ্চন্দ্রকে কৌশলক্রমে সত্যপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রজা, কোষাগার প্রভৃতির সহিত সমস্ত রাজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত রাজ্য অর্থাৎ সসাগরা পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস করিতে এবং দানের আনুসঙ্গিক দক্ষিণা দিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণকে দানের সহিত কিঞ্চিৎ দক্ষিণা না দিলে সে দান নিষ্ফল হয়, এইরূপ ধারণাবশত বোধ হয়, হরিশ্চন্দ্র দানের

উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহা প্রার্থনা করাতে হরিশ্চন্দ্র স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। বিশ্বামিত্র শাপ দিতে উদ্যত, তখন হরিশ্চন্দ্র এক মাসের সময় ভিক্ষা করিলেন। বিরক্তির সহিত ক্রোধান্ধ মুনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন যে তিনি কোথায় যাইবেন; যখন তিনি তাঁহার সমগ্র পৃথ্বীরাজ্য বিশ্বামিত্রকে অর্পণ করিয়াছেন এবং যখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সপরিবারে এই অর্পিত রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন, তখন তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়া বিশ্বামিত্রের রাজ্য মধ্যে বাস করিতে পারেন না। অবশেষে তিনি সপরিবারে কাশীগমনই একমাত্র বাসস্থান স্থির করিলেন, কারণ বারাণসী কখন মনুষ্য ভোগ্য হইতে পারে না (তখন এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত হইয়াছিল); এইরূপ ভাবিয়া তিনি সপরিবারে কাশীর অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। যাত্রাপথে লোক আর ধরে না—লোকে লোকারণ্য। তাঁহার প্রজাগণ দলে দলে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাজেই হরিশ্চন্দ্রের শীঘ্র প্রস্থান বিষয়ে কিছু বাধা পড়িতে লাগিল। তাহাতে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ভর্ৎসনা

করিতে লাগিলেন এবং সহসা একটা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা নিরপরাধা হরিশ্চন্দ্র-পত্নীকে তাড়না পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাহাতে কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ না করিয়া "যাইতেছি" এইমাত্র বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রকে টানিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন, তখন ভিক্ষাপ্রাপ্ত এক মাস সময় পূর্ণ হইতে এক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেই দিন তাঁহারা কাশীতে পৌছিবামাত্রই বিশ্বামিত্রও কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন এবং তাহা না পাইলে অভিশাপ দিবারও যথেষ্ট ভয়প্রদর্শন করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্বীকার করিলেন যে, সমস্ত দিবসের মধ্যে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দিতে না পারিলে তিনি নিশ্চয়ই শাপগ্রস্ত হইবার যোগ্য। বিশ্বামিত্র এই কথায় চলিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি চলিয়া যাইতে না যাইতেই হরিশ্চন্দ্রের মহাচিন্তা আসিল যে কি উপায়ে এই দক্ষিণা সংগ্রহ করিবেন। অবশেষে পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহাদের উভয়ের আত্মবিক্রয় ব্যতীত এই

দক্ষিণা সংগ্রহের অন্য উপায় নাই। এইরূপ স্থির হইবার পর তাঁহারা এক দোকানের প্রান্তে বসিয়া আপনাদিগকে বিক্রয়ার্থ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার অর্দ্ধেক মুদ্রা মূল্য স্বরূপে দিয়া হরিশ্চন্দ্রপত্নীকে ক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন। এইরূপে হরিশ্চন্দ্রপত্নী শৈব্যাকে ব্রাহ্মণ ক্রয় করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। তাহা দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রতনয় রোহিতাশ্ব মাতার বস্ত্র ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তজ্জন্য উক্ত ব্রাহ্মণের নিকটে এক পদাঘাত পাইয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে শৈব্যার অনুরোধে ব্রাহ্মণ আরও কিছু দিয়া হরিশ্চন্দ্রতনয় বালক রোহিতাশ্বকেও ক্রয় করিয়া লইলেন। বিশ্বামিত্র পুনরায় আসিয়া দক্ষিণা প্রার্থনা করিলে হরিশ্চন্দ্র কতকটা আশ্বাসের সহিত স্ত্রীপুত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিতে গেলেন, কিন্তু সেই মুনি তীব্র তিরস্কারের সহিত প্রতিশ্রুত দক্ষিণা সেই দিবসের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র পুনরায় আপনাকে বিক্রয়ার্থ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে এক চণ্ডাল আসিয়া দক্ষিণার অবশিষ্ট অংশের

বিনিময়ে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালদাসত্ব প্রথমে অস্বীকার করিয়া, অবশেষে বিশ্বামিত্র আসিয়া শাপভীতি প্রদর্শন করাতে, পরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সেই চণ্ডালের অধিকারে একটী মহাশ্মশান ছিল; হরিশ্চন্দ্র সেই শ্মশানে থাকিয়া মৃতব্যক্তিগণের পরিধেয় বস্ত্রসংগ্রহের নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, এক দিন শৈব্যা সর্পদংশনে মৃত বৎস রোহিতাশ্বকে শ্মশানে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা প্রকার দুঃখে কষ্টে, চণ্ডালোচিত আহার ব্যবহারে, দাসীবৃত্তিরূপ কষ্টকর কর্ম্মে হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার পত্নীর মঙ্গলমূর্ত্তির অনেক বিকৃতি সাধিত হওয়াতে তাঁহাদের কেহই পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন না। সর্পদংশনে রোহিতাশ্বেরও মূর্ত্তি বিকৃত হওয়াতে হরিশ্চন্দ্র তাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার নিকটে অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভুর আদেশানুসারে মৃত শিশুর বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। ইত্যবসরে শৈব্যার বিলাপোক্তিতে তাঁহার আপনার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া তিনি শৈব্যাকে চিনিতে পারিলেন এবং

তাঁহার নিকটে নিজেও আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। অবশেষে তাঁহারা উভয়েই মৃতপুত্রের চিতাগ্নিতে দেহত্যাগ করাই পরামর্শসিদ্ধ স্থির করিলেন। ধর্ম্ম তখন সমস্ত দেবগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাদিগকে এই কঠোর কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহারাই এইরূপ লীলা করিয়াছেন। ইন্দ্রদেব অমৃতবৃষ্টি দ্বারা রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবিত করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশেষে দেবগণ হরিশ্চন্দ্রকে সপরিবারে স্বর্গ গমনের বর-প্রদান করিলেন। হরিশ্চন্দ্র তদুত্তরে ভক্ত-ত্যাগের দোষ দেখাইয়া বিনীতভাবে জানাইলেন যে, তাঁহার রাজ্যের ভক্তপ্রজাগণকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিতেও ইচ্ছুক নহেন; কিন্তু যদি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া একটী দিনও স্বর্গভোগ করিতে পারেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়। অগত্যা দেবগণ তাহাতেই অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরিবার ও প্রজাবর্গের সহিত স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন।

প্রচলিত নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার মূল উপাখ্যান হইল এই। ইহা একটী করুণসোদ্দীপক উপাখ্যান বটে, কিন্তু এই উপাখ্যানে ঐতিহাসিক সত্যের একটা প্রাণ নাই। এই কৃত্রিম উপাখ্যান যে কিরূপে পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইল, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই উপাখ্যানে প্রাচীন আখ্যানের দুএকটী নাম ছাড়া অন্য সংশ্রব যেন ইচ্ছা করিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা পড়িলেই বুঝা যায় যে, ইহার কবি একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাখ্যান রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—তাই ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের অন্তরে বিঘ্নরাজের প্রবেশ, বিশ্বামিত্র কর্তৃক বিনাদোষে হরিশ্চন্দ্রপত্নীর তাড়না, এই সকল আড়ম্বর স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাতে শৈব্যাতাড়না, হরিশ্চন্দ্রতনয় রোহিতাশ্বকে বৃদ্ধব্রাহ্মণের পদাঘাত, ক্ষুধিত রোহিতাশ্বের পিতামাতার নিকটে অন্নভিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি করুণরসের প্রাদুর্ভাব অনেকটা রাখিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্র তেমন ভালরূপে প্রত্যেকের উপযুক্তমত অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। কবি যদি ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত সত্য আখ্যানকেই

কবিত্বের পরিচ্ছদে ভূষিত করিতে প্রয়াস পাই-
তেন, তাহা হইলে চরিত্র বিকশিত করিবার
জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না—
সত্যেরই বলে তাহা সহজেই সুসিদ্ধ হইত।

এই কৃত্রিম হরিশ্চন্দ্রকথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে
স্থান পাওয়াতেই আমাদের বোধ হয় যে এই
পুরাণ অত্যন্ত আধুনিক—মহাভারতের অত্যন্ত
পরবর্ত্তী কালে রচিত। এই পুরাণ যে মহা-
ভারতের অনেক পরে রচিত, এই একটী ছাড়া
আরও কতকগুলি কারণে আমরা তাহা অনুমান
করি। ইহার প্রথমেই ব্যাসরচিত মহাভারতের
কথা উক্ত হইয়াছে; দ্রৌপদী কি প্রকারে
পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হইতে পারিলেন তদ্বিষয়ে
প্রশ্ন করা হইয়াছে, ইত্যাদি। ইতিহাস আলো-
চনা করিলে অনুমান হয় যে. কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের
পর ক্ষত্রিয়প্রতাপ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল
এবং সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা প্রাধান্য লাভ করিতে
প্রয়াস পাইয়াছিলেন ও তাহাতে সফলকাম
হইয়াছিলেন। বোধ হয়, সময়ে এই ব্রাহ্মণ-
প্রাধান্যের অতিমাত্র বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার প্রতি-
ক্রিয়ার চেষ্টা হইতেছিল এবং খুব সম্ভবতঃ সেই
প্রতিবিধান-চেষ্টারই অভিব্যক্তিতে বুদ্ধদেবের

অভ্যুদয় হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে, এই বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় ও মহাভারত রচনা, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালেরই হস্ত দেখা যায়। বুদ্ধদেব ও মহাভারতের অন্তর্বর্ত্তী সময়কে পৌরাণিক সাহিত্যের কাল বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে মহাভারত হইতে পৃথক্ পৃথক্ আদর্শ লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক পুরাণও লিখিত হইয়াছিল; এইরূপে পৌরাণিক সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিলে সর্ব্বশেষে বোধ হয়, বিরোধবিবাদ-ভঞ্জনব্রত লইয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণকার তাঁহার পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে, অনুমান হয় যে, সাহিত্যক্ষেত্রের নেতামাত্রেই এইরূপ পুরাণের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মত প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।*

---

* মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিভিন্ন অংশে ব্রহ্মার, বিষ্ণুর এবং দেবীর অথবা শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে দেখা যায় অর্থাৎ ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব দেখা যায় না, সেই কারণে পরলোকগত অধ্যাপক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে অন্যতর প্রাচীনতম পুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌ও এই মতের পোষকতা

মার্কণ্ডেয় পুরাণকার তাঁহার হরিশ্চন্দ্রকথায় যে করুণরসোদ্দীপনার বহুল যত্ন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের মতে এই পুরাণের আধুনিকত্বের অন্যতর পরিচায়ক। আমরা দেখি যে দেশ যতই সভ্যভব্যতার দিকে অগ্রসর হয় ততই লোকে পরুষ বীরভাব, চঞ্চল অশান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসকলের অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া উঠে †। ইংলণ্ডের যে সময়ে মহাকবি সেক্ষপীয়র তাঁহার অশান্তি-

---

করিয়াছেন ("Indian Wisdom, 2ed. P. 494)। কিন্তু এই প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব না থাকাতেই আমাদের অনুমান হয় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্যতর নবীনতম পুরাণ। যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের পরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চলিয়া গিয়াছিল, যখন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ধীরতার সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়াছিলেন যে, কোন সম্প্রদায়ই বিদ্বেষের অথবা ঘৃণার পাত্র হইতে পারে না, তখনই এরূপ সমন্বয়কারী অসাম্প্রদায়িক পুরাণের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব—বিভিন্ন সম্প্রদায় সংগঠিত হইবার কালে এবং সুতরাং বিদ্বেষভাবের অস্তিত্বকালে অথবা বিভিন্ন সম্প্রদায় সংগঠিত হইবার পূর্ব্বে কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে।

† তাই বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে আমি মহাভারতীয় কালকে অসভ্যতার কাল বলিতেছি।

মাথা গানে সকলকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে সময়ে টেনিসনের কোমলতাময় গার্হস্থ্যসুখগীতি হাস্যাস্পদ হইত। আবার এখন টেনিসনের কবিতা আমাদের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু এ সময়ে অশান্তি ও চপলতার আদর্শধারী সেক্ষপীয়রের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা দুরাশা। সেইরূপ যে সময়ে নানাবিধ রসের আধার মহাভারতের অশান্তিময় গীত সকল ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই সময়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণের ন্যায় ধীরগম্ভীর পুরাণ সকলের অভ্যুত্থান অসম্ভব। এবং যে সময়ে কবি হরিশ্চন্দ্রকথার করুণগীতি গাহিয়া লোকের মন আর্দ্র করিবার যত্ন পাইয়াছেন, সে সময় মহাভারতের সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব। যে মার্কণ্ডেয় পুরাণে এমন করুণরসাত্মক হরিশ্চন্দ্রকথা স্থান পাইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন—আধুনিক। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রাচীনযুগ নূতনযুগের জন্মদান করিয়া চলিয়া যাইবার পর যখন পৃথিবী শান্ত হইল, যখন সকলেই আপন আপন রাজার অধীনে থাকিয়া পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল, যখন মহাভারতের মহাযুদ্ধ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকল

অতীতের স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, যখন ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের কারণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে "বিপ্রমুখ্য"-রূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন সেইরূপ সময়েই শান্তিপ্রিয় মার্কণ্ডেয় পুরাণের আবির্ভাব হইতে পারে। ইহার বহুকাল পরে এইরূপ অপর কোন সুশান্ত সময়েই উত্তররামচরিত, অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতির জন্মলাভ হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ এইরূপ শান্তিপূর্ণ কালে মার্কণ্ডেয়-পুরাণের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই—ইহার সময়ে যুদ্ধবিগ্রহাদির কোনরূপ গোলযোগের সম্পর্কমাত্র ছিল না বলিয়াই, পৌরাণিক হরি-শ্চন্দ্র একেবারে ভীরু ও কাপুরুষ অথচ বাগা-ড়ম্বরপ্রিয়রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখে খুব লম্বাচৌড়া কথা আছে, কিন্তু কাজের বেলায় তদনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত-কলেবর। স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র মহা আস্ফালন করিয়া ধাবিত হইলেন যে, তাঁহার শাসনকালে যে দুর্বুদ্ধি স্ত্রীলোকদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করে, শীঘ্রই তাহাকে যমসদন দর্শন করিতে হইবে—

"ময়ি শাসতি দুর্মেধাঃ কোঽয়ন্যায়বৃত্তিমান্॥
মাং পুং ৭অ, ৫

কোঽয়ং বধ্নাতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃন্নরঃ।
বলোষ্ণতেজসা দীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে॥
ঐ, ১২

সোঽদ্য মৎকার্ম্মুকাক্ষেপাবদীপিতদিগন্তরৈঃ।
শরৈর্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি॥
ঐ, ১৩

কিন্তু যেই ক্রোধপ্রজ্বলিত বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইলেন, অমনি "অশ্বত্থপত্রের ন্যায়" কাঁপিতে লাগিলেন—"ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশ্বত্থপর্ণবৎ।" তাহার পরে তিনি সভয়ে বিপ্রশ্রেষ্ঠদিগকে দান করা কর্ত্তব্য, আর্ত্তদিগের রক্ষা করা কর্ত্তব্য ইত্যাদিরূপ রাজধর্ম্মের দুএকটী কথা বলিলেন। তদনন্তর বিশ্বামিত্র উপযুক্ত দক্ষিণার সহিত দান ভিক্ষা করিলে রাজা আপনাকে "পুনর্জাত বলিয়া বিবেচনা করিলেন।" এবং তিনি যেন কাপুরুষোচিত ভয়ে আপনার সর্ব্বস্ব, এমন কি স্ত্রীপুত্র অবধি সকলই, বিশ্বামিত্রের চরণে সমর্পণ করিতে অবসর পাইতেছিলেন না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখে প্রভুর খামখেয়ালী মেজাজে ভীত মোসাহেবদিগের

"যে আজ্ঞা" যেন সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। বিশ্বামিত্র বলিলেন "কোষাগার ও ধনরত্নের সহিত সমস্ত রাজ্য আমাকে প্রদান কর।" হরিশ্চন্দ্র হৃষ্টমনে (?) "যে আজ্ঞা" বলিলেন।

"প্রহৃষ্টেনৈব মনসা সোঽবিকারমুখো নৃপঃ।
তস্যর্ষের্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥"

আবার যখন প্রজাবর্গ তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, তখন সেই বিশ্বামিত্র আসিয়া ভৎ'সনা করিলেন, অমনি তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে "আজ্ঞে যাচ্চি" বলিয়া পত্নী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতকে দ্রুত টানিয়া লইয়া চলিলেন। পরক্ষণেই যখন বিশ্বামিত্র নিরাপরাধা শৈব্যাকে দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা আঘাত করিলেন, তখনও হরিশ্চন্দ্র "আজ্ঞে যাচ্চি"র অধিক কথা বলেন নাই এবং একথা কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হয়াছেন।—

"তাং তথা তাড়িতাংদৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
গচ্ছামীত্যাহ দুঃখার্ত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদুপাহরৎ॥"

কবি ভাবিয়াছেন, বুঝি এইরূপ চিত্রে রাজার সমধিক বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার ইহা বুঝিবার ভুল। ইহাতে সমধিক কাতরতা প্রকাশ

পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে রাজোচিত বীরত্ব, ক্ষত্রিয়োচিত তেজ এবং মনুষ্যোচিত সাহসের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। এমন কি, ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজে যে রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন "রক্ষ্যাভীতাঃ সদা যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরিপন্থিভিঃ", স্বীয় ধর্ম্মপত্নী শৈব্যাকে তাড়না হইতে রক্ষা-না করায় আমাদিগের মতে তিনি সেই রাজধর্ম্ম হইতেও বিচ্যুত হইয়াছেন—বিশেষতঃ তখনও শৈব্যা তাঁহারই অধীনে ছিলেন, কাহারও নিকটে বিক্রীত হয়েন নাই।

কবি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সত্যপালনের জন্য সর্ব্বত্যাগী এইরূপ একটী আদর্শ চরিত্র দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। প্রথমেই হরিশ্চন্দ্র একেবারে সর্ব্বস্ব দিতে স্বীকার করায় তাঁহার অত্যন্ত অবিবেচনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পরেও দেখি যে হরিশ্চন্দ্র প্রতিপদে শাপভয়ে ভীত হইয়াই কার্য্য করিতেছেন, প্রকৃত সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গের ভাবে তাঁহার অধিকাংশ কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতে দেখি না। স্ত্রীপুত্রবিক্রয়ে হরিশ্চন্দ্র অবশ্য প্রথমে অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে পত্নী শৈব্যা তাঁহাকে বারম্বার

ব্রহ্মশাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য উত্তেজিত করায় তিনি যখন স্ত্রীপুত্রবিক্রয় করিয়া প্রতিশ্রুত দক্ষিণার অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হইলেন, তখন যেন তাঁহার কতকটা নিষ্কৃতির ভাব আসিয়াছিল— মনে করিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্রকে আপাতত এই অর্দ্ধেক দক্ষিণা দিয়া আরও কিছু বেশী সময় ভিক্ষা করিয়া লইবেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র সমস্ত দক্ষিণা একেবারে প্রার্থনা করাতে তিনি যখন আপনাকে বিক্রয়ার্থ বিপণিতে উপনীত করিলেন, তখনই তাঁহার অন্তরস্থিত শাপভয় প্রকাশ পাইয়া গেল। চণ্ডালবেশী ধর্ম্ম তাঁহাকে ক্রয় করিতে আসিলেন; কিন্তু হরিশ্চন্দ্র যেই জানিতে পারিলেন যে তাঁহার ক্রেতা একজন চণ্ডাল, তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন যে শাপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়া ভাল কিন্তু চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার শ্রেয়স্কর নহে।

"নাহং চণ্ডালদাসত্ব মিচ্ছেয়ং সুবিগর্হিতং।
বরং শাপাগ্নিনা দগ্ধো ন চণ্ডালবশংগতঃ॥"

এখানেই দেখা যাইতেছে যে হরিশ্চন্দ্র এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা শাপাগ্নিতে দগ্ধ হইবার ভয়ে ভীত হইয়াই করিয়াছিলেন; তবে চণ্ডালদাসত্ব নাকি অত্যন্ত

ঘৃণিত বোধ হইয়াছিল, তাই এরূপ আন্তরিক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। হরিশ্চন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন. এমন সময়ে বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত। আবার তাঁহার শাপভয়ে হরিশ্চন্দ্রের সেই চণ্ডালদাসত্ব স্বীকার করিতে হইল, কেবল ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি বালকোচিত অভিমান প্রকাশ পাইল মাত্র।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের হরিশ্চন্দ্রকথায় একটীও চরিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের চিত্র যেমন একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বামিত্র, শৈব্যা এবং হরিশ্চন্দ্রতনয় রোহিত, সকলেরই চিত্র অতি অমনোগ্রাহী রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। শৈব্যাকে সুবিখ্যাত রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের পত্নী রূপে অঙ্কিত করিতে গেলে তাঁহাতে একপ্রকার তেজোময় ধৈর্য্য আরোপ করা উচিত ছিল। এবিষয়ে আর বাহুল্য রূপে বলিতে ইচ্ছা করি না—যাঁহারা ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে বীরপত্নীর চিত্র কিরূপ হওয়া উচিত। উক্ত গ্রন্থে যখন যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর তীব্র তিরস্কারপূর্ণ অথচ গুরুগম্ভীর উক্তি সকল পাঠ করা যায়, তখন তাহার

প্রত্যেক কথা যেন হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিতে থাকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কবি তাঁহার হরিশ্চন্দ্র কথাকে করুণরসাত্মক করিতে গিয়া ক্ষত্রিয়বীর হরিশ্চন্দ্রকে নিরীহ বাঙ্গালীর ন্যায় নিতান্ত দীন-চরিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন; হরিশ্চন্দ্রপত্নী শৈব্যাকে অন্তঃপুরবদ্ধা বঙ্গীয় কুলললনার ন্যায়, বীরবালক রোহিতকে একটি ভীরু, পদাঘাত-সহিষ্ণু সাত আট বৎসরের দুর্বলদেহ, মাতার অঞ্চলধারী সুকুমার বঙ্গীয় শিশুর ন্যায় এবং বিদ্বান্, ন্যায়পর তেজস্বী মুনি বিশ্বামিত্রকে কোপনস্বভাব, প্রতি নিঃশ্বাসে শাপভীতি-প্রদর্শক, অর্থগৃধ্নু, শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও বাক্যসার বঙ্গদেশীয় অতৃপ্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

যাই হোক্, মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত এই হরিশ্চন্দ্রকথা করুণরসোদ্দীপক হওয়াতে ভব্যতাভিমানী আধুনিক কালের যে সকল লেখক এই বিষয়ে লিখিতে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথারই অনুসরণ করিয়াছেন। কবি আর্য্যক্ষেমীশ্বর সংস্কৃতভাষায় এই পৌরাণিক কথাকেই এক

চণ্ডকৌশিকে হরিশ্চন্দ্রকথা।

আধটুকু পরিবর্ত্তন সহকারে নাটকের পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক চণ্ডকৌশিক গ্রন্থ রচনা করিয়া সমুদায় ভারতবর্ষে ইহার প্রচার হইবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। * পণ্ডিতগণের মতে ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে বেণীসংহারের সমান আসন অধিকার করিতে পারে—তাহার কারণ, ইহাতে অলঙ্কার—শাস্ত্রানুযায়ী দোষের ভাগ অতি অল্পই আছে। হইতে পারে যে, আলঙ্কারিক নিয়মানুযায়ী ইহার বিচার করিলে অধিক দোষ প্রকাশ পাইবে না। এরূপ হওয়া

---

* পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই নাটক অন্যূন ৪০০ বৎসর ও অনধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। এই পুস্তক খুব সম্ভবতঃ কোন দক্ষিণাত্যনিবাসী পণ্ডিত রচনা করিয়া থাকিবেন। শ্রীযুক্ত ই, বি, কাবেল মহোদয় (Prof. E. B Cowell) যখন সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি এই পুস্তক মুদ্রিত করাইবার অভি-প্রায়ে আর্য্যাবর্ত্তে সেই পুস্তক কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে একখানি হস্তলিপি এবং একখানি প্রস্তরলিপি আনাইয়াছিলেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্যেই ইহার বহুল প্রচার ছিল অনুমিত হইতে পারে। বিশেষতঃ সূত্রধারের উক্তি হইতে আমাদের আরও অনুমান হয় যে, ইহার কবি কর্ণাটবিজয়ী কার্ত্তি-কেয় শ্রীমহীপালদেবের অন্যতর সভাপণ্ডিত ছিলেন।

কিছু বিচিত্র নহে। কারণ ইহাতে মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথাকে অত্যল্প পরিবর্ত্তন সহকারে অনুসরণ করা হইয়াছে। এরূপ অবলম্বন পাইলে একটী গ্রন্থকে আলঙ্কারিক নিয়মানুযায়ী বিশুদ্ধ করা অধিক চিন্তারও কার্য্য নহে এবং দুঃসাধ্যও নহে। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে দেখা যাইবে যে, ইহাতে নাটকের একটা প্রাণ রক্ষিত হয় নাই। কেমন করিয়াই বা হইবে—একটা গ্রন্থের বিষয়টী প্রাণের ভিতরে না মিলাইয়া লইয়া অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিলে কখন কি সেই নূতন গ্রন্থে প্রাণ দেওয়া যাইতে পারে? চণ্ডকৌশিকে এই অন্ধ অনুসরণ এত অধিক করা হইয়াছে যে, পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, ইহারও চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। ততোধিক, চণ্ডকৌশিকপ্রণেতা কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়া দৃশ্যকাব্যের সহজ ভাবকে একেবারে বধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। একটী কথায় তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার দোষ বড়ই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালেই তাঁহাকে আড়ীবকযুদ্ধ-

সম্বলিত বাক্যে সম্বোধন করিয়াছেন। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পরের অভিশাপে আড়ীবকরূপ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণোক্তি আছে; কিন্তু আর্য্যক্ষেমীশ্বরের জানা উচিত ছিল এবং অনেকেই বোধ হয় জানেন যে তাঁহাদের সেই আড়ীবকরূপ প্রাপ্তির কারণ হইল হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু। সুতরাং হরিশ্চন্দ্রের মুখে আড়ীবকের কথা বসান নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইয়াছে বলিতে হইবে।

কৃত্তিবাসোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথা।

সংস্কৃত ভাষায় আর্য্যক্ষেমীশ্বর এই হরিশ্চন্দ্রকথাকে নাটকাকারে পরিণত করাতে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যেমন এই কথার কোমলতাময় করুণরস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, বঙ্গদেশে কবি কৃত্তিবাস এই করুণরসাত্মক হরিশ্চন্দ্রকথাকে তাঁহার রামায়ণে (আদি, হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান) স্থানদান করাতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার করুণরস আস্বাদন করিয়া ততোধিক পরিতৃপ্ত হইতেছে। আর্য্য ক্ষেমীশ্বরের ন্যায় কবি কৃত্তিবাসও মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই হরিশ্চন্দ্রকথাকে অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া-

ছেন বলিলেও চলে। তবে, কৃত্তিবাস রোহি-
তাশ্বকে রুহিদাস এবং আরও কতকগুলি
নিতান্ত বাঙ্গালীভাব প্রবিষ্ট করাইয়া তাঁহার
হরিশ্চন্দ্রকথাকে একেবারে নিছোক বাঙ্গালী
করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি মূল কথাকে কিরূপে
পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহা দেখিবার বিষয়
বটে। একটী প্রধান দৃষ্টান্ত দিই—

কৃত্তিবাসের মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহার
বিপদের অবসানে স্বীয় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার
সমর্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠারোহণের চেষ্টা করিলেন।
আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে মার্ক-
ণ্ডেয় পুরাণের মতে হরিশ্চন্দ্র একাকী স্বর্গে
যাইতে অস্বীকার করায় দেবগণের নিকটে স্বীয়
ভক্ত প্রজাগণের সহিত স্বর্গগমনে অনুমতি
পাইয়াছিলেন। কৃত্তিবাস আর একটু মাত্রা
চড়াইয়া বলিলেন যে হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে—

"পুরীর সহিত চলে বৈকুণ্ঠ ভবনে।
কুকুর বিড়াল আদি যে ছিল যেথানে॥"

এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাসের মনে সন্দেহ
হইল যে তিনি বৈকুণ্ঠে কুকুর বিড়ালদিগকে
সশরীরে প্রেরণ করিয়া ভাল করেন নাই; তাই
তাড়াতাড়ি তাহাদের স্বর্গগমন বন্ধ করিতে

গিয়া একটা বৃথা আপত্তি দেখাইয়া একেবারে রাজা হরিশ্চন্দ্রেরই বৈকুণ্ঠগমন রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বলেন যে, বিষ্ণু হরিশ্চন্দ্রের এই উৎপাতজনক ব্যাপারে ভীত হইয়া নারদকে বিপদ জানাইয়া বলিলেন "স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।" তখন নারদ যথাসত্বর হরিশ্চন্দ্রের নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে তিনি প্রায় স্বর্গে উঠিয়াছেন। নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন্ পুণ্যের বলে তিনি স্বর্গে যাইতেছেন। তাঁহার এইরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হরিশ্চন্দ্র যেমন আত্মপ্রশংসা করিবেন, অমনি তাঁহার স্বর্গে প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই বিষ্ণু তাঁহার বৈকুণ্ঠ-ভবনে কুকুর বিড়ালাদির সশরীরে প্রবেশভয় হইতে নিশ্চিন্ত হইবেন। কার্য্যেও তাহাই ঘটিল,—

"মুনি বলে যাও রাজা কোন্ পুণ্য ফলে॥
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য সব আপনি কহিতে লাগিল॥
বাপী কূপ তড়াগাদি নানা স্থানে করি।
দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি॥

* * * *

পুণ্য কথা যেই রাজা কহিতে লাগিল॥

কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল ॥

* * * *

স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্ত না পাইল ।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল ॥

মধ্যপথে অবস্থিতিরূপ এই ঘটনাটী কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছাতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আত্মপ্রশংসাতে যে স্বর্গ-হানি হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক উপাখ্যানের উল্লেখ আছে এবং পুরাণে হরিশ্চন্দ্রপিতা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যপথে থাকিবার উল্লেখ দেখা যায়। কবি কৃত্তিবাস কাহাকেও একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বেমালুম উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন।

চণ্ডকৌশিকোক্ত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথা পড়িলেই বুঝা যায় যে, আর্য্যক্ষেমীশ্বর এবং কৃত্তিবাস উভয়েই এই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথা করুণরসোদ্দীপক বলিয়াই আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে অধিকতর করুণরসোদ্দীপক করিবার চেষ্টাও পাইয়াছেন। করুণরস অধিকতর উদ্দীপিত করিবার জন্য উভয় গ্রন্থেই হাহুতাশব্যঞ্জক

কতকগুলি শব্দ ও কৃত্রিম ক্রন্দনের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও যে এরূপ করা হয় নাই তাহা নহে—প্রত্যুত মার্কণ্ডেয় পুরাণই ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ—তবে তাহাতে ক্রন্দনের এতটা আধিক্য নাই। আমাদের মতে এইরূপ ক্রন্দনভাবের বাহুল্যই ইহাদিগের আধুনিকত্বের অন্যতর সুপরিচায়ক। মহাভারতেও নলদময়ন্তী প্রভৃতি অনেক করুণরসপূর্ণ আখ্যান আছে, কিন্তু সেগুলিতে ক্রন্দনের অথবা হাহুতাশব্যঞ্জক শব্দের এত বাহুল্য নাই। এইরূপ ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের আধিক্য অনেক দুর্ব্বলচিত্ত বালকের সহানুভূতি ও করু-ণার ভাব উদ্রেক করিবার সহায়তা করিতে পারে, জ্ঞানোন্নত যুবকদিগের নহে। পুরাকালের বীরহৃদয় আর্য্যসন্তানগণ নিতান্ত বালকস্বভাব ছিলেন না, তাই মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে ক্রন্দনের সেরূপ একটা মহারোল উঠিতে দেখা যায় না। যখন সংস্কৃতভাষা আর্য্যদিগের মধ্যে কথোপকথনের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত এবং যখন আর্য্যদিগের প্রাণমন বীরোচিতভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন ক্রান্তদর্শী কবিগণও জানিতেন যে তাঁহারা স্ত্রীজনসুলভ হাহুতাশ

অতিমাত্র ব্যক্ত করিবার এবং বালকোচিত ক্রন্দনরোল উঠাইবার চেষ্টা করিলে পাঠকদিগের সহানুভূতি লাভ করিবেন না এবং সুতরাং সে বিষয়ে চেষ্টাও করেন নাই। ক্রমে যখন আর্য্যসন্তানেরা দুর্ব্বলহৃদয় হইতে লাগিলেন, যখন তাঁহারা ভব্যতার ক্রীতদাস হইতে লাগিলেন, তখন হাহুতাশের অতিমাত্র ব্যবহার এবং প্রতিপদে ক্রন্দনরোল আনয়ন করা সহানুভূতি আকর্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ অথবা গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীজনের আর্ত্তোক্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখ, দেখিবে যে, সেই বিলাপের মধ্যেও কেমন এক বীরভাব, কেমন এক মনুষ্যোচিত সংযতভাব পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। অপরদিকে উত্তররামচরিতের রামবিলাপ; কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ প্রভৃতি পড়িয়া দেখ, কি এক প্রকার অসংযতভাব আসিয়া যেন মনুষ্যত্বকে দলিত করিতে উদ্যুক্ত রহিয়াছে। কালিদাস একজন প্রকৃত কবি ছিলেন, তাই তিনি ইহার অসঙ্গতি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অভিজ্ঞানশকুন্তলে করুণভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্বও ফুটাইবার চেষ্টা

করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বর্ত্তমানে হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া যে সকল কাব্যনাটক রচিত হয়, তাহাদের প্রায় সকলেতেই মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করা হয়, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

এতক্ষণে আমরা দেখাইয়া আসিলাম যে আধুনিক হরিশ্চন্দ্রকথার মূল আদর্শ মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত উপাখ্যান; এবং ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কবি সেই পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রগুলি সুন্দররূপে বিকশিত করিতে পারেন নাই। এই গুরুতর দোষসত্ত্বেও এই উপাখ্যানের এত সুদূরব্যাপী প্রচলন হইল কেন? আমরা এই উপাখ্যানকে উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারি কি না? আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের সহিত একমত হইয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, হিন্দুজাতি এই উপাখ্যান পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই উপাখ্যানের সহিত সমস্ত ভারতের কি না জানি না, অন্ততঃ এই বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের শুভাশুভ এতদূর জড়িত হইয়া আছে যে ইহাকে

পরিত্যাগ করা অসম্ভব। এই উপাখ্যান শত শত হিন্দু নরনারীকে শুভকর্ম্মে, ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগে উৎসাহ ও বল প্রদান করিয়াছে এবং এই উপাখ্যান সমগ্র হিন্দুজাতির সম্মুখে একটী মহান্ আদর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই পৌরাণিক উপাখ্যানের কবি ইহার পাত্রগণের চরিত্রগুলি সম্যক্ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই সত্য; কিন্তু তিনি প্রধান পাত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে যে আদর্শ-কেন্দ্রে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা-তেই হিন্দুজাতি মুগ্ধ হইয়া ইহাকে এত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং চিরকাল করিতে থাকিবেন।

হিন্দুজাতি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাধনা লইয়াই চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাই যখনই তাঁহারা এই উচ্চ আদর্শকেন্দ্রে স্থাপিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই-লেন, তখনই তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। সাগরে এক গভীর জলরাশি সঞ্চিত আছে বলিয়াই যেমন আমরা যেখানেই উপযুক্তরূপ খনন করি, সেইখানেই জল প্রাপ্ত হই—সাগরের জল অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইয়া যেমন সমুদ্রয়

পৃথিবীকে সিক্ত রাখিয়াছে; সেইরূপ পিতৃ-পুরুষদিগের সঞ্চিত ধর্ম্মের বিমল বারি আমাদের আত্মার গভীর অন্তস্তলে অন্তঃপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া এই অশান্তিময় কালের সাগরে আমা-দিগকে একেবারে ভাসিয়া যাইতে দিতেছে না, আমাদিগকে স্থিরপথে ধরিয়া রাখিতেছে। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি এখনও অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হইতে পারেন, সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারেন। ধর্ম্মের এই গূঢ়প্রবাহ স্রোত থাকাতেই আমরা সেই উচ্চ আদর্শে স্থাপিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথাকে আদরের সহিত গ্রহণ করি। সেই উচ্চ আদর্শ কি—না, নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির আদর্শ থাকাতেই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথা আমাদের এত প্রিয়। আমরা দেখিতে চাই না যে,উপাখ্যানটী সত্য বা মিথ্যা, প্রকৃত বা কল্পিত; আমরা দেখিতে চাই না যে কবি চিত্রগুলি প্রকৃত চিত্রকরের তুলিকায় সুন্দররূপে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন কি না। সমস্ত উপাখ্যানটীর অন্তর্নিহিত নিবৃত্তিভাবের প্রবাহই আমাদিগকে সমধিক আকৃষ্ট করে।

হিন্দুজাতি যখন সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা বুঝিয়া-

ছিলেন যে নিবৃত্তিই একমাত্র ধর্ম্মরক্ষা করিতে এবং সুতরাং জগতের হিতসাধনে সমর্থ। তাই ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতা নিবৃত্তিকেই মহা পুণ্যজনক ঘোষণা করিয়া সকলকে ধর্ম্মের পথে, সংযমের পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দিয়াছেন। প্রবৃত্তির ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে নিবৃত্তিই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়স্তম্ভ, একমাত্র রক্ষাকবচ; নিবৃত্তিই ধর্ম্মেব প্রাণ, ধর্ম্মের কেন্দ্র। মনুসংহিতার আরও পূর্ব্বে যাইয়া দেখ, উপনিষদও জলদের ন্যায় মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন যে শ্রেয় অর্থাৎ নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিলেই আমাদের মঙ্গল এবং প্রেয় অর্থাৎ নিবৃত্তির পথে চলিলে আমাদের মঙ্গল নাই—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব উপভোগ করা যায়। আবার মনুসংহিতার বহু পরে ভগবদ্গীতা খুলিয়া দেখ, কেমন সুন্দর ভাষায় এই নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিবার যত্ন ও চেষ্টা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে পারি যে, নিবৃত্তিই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাণ। এই নিবৃত্তিভাবই হিন্দুজাতির হৃদয়মনকে ধর্ম্মাভিমুখী রাখিয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত রাখিয়াছে। কিন্তু আর বুঝি তাহা থাকে না—বর্ত্তমানে

আমরা নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য-দিগের অনুকরণে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া অধোগতির দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

বর্ত্তমানে কালস্রোতের প্রতিকূলে এইরূপ হস্তোত্তোলন করাতে অনেকেরই নিকট যে নিঃসন্দেহ উপহাসাস্পদ হইব, তাহা জানি। কিন্তু সত্যের সম্মুখে উপহাসের ভয়ে ভীত হইলে মঙ্গল হইবে না, তাহাও নিশ্চিত। আমাদের ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, আমরা উদ্দাম প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া অবনতির পথ, বিনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছি, তথাপি আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিরূপে নিদ্রিত থাকিব? আমরা নিজে সেই বিনাশের পথে দণ্ডায়মান হইলেও, স্রোতের প্রতিকূলে এক পা উঠিতে না পারিলেও আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ চীৎকার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরাকে রক্ষার একটী প্রধান উপায় বলিয়া যাইতে পারিব,—যাহাতে তাহারা আমাদের পতনদৃষ্টে প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইবার পূর্ব্বেই অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও স্থিরভাবে, ধীরভাবে চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় যে তাহাতে

ঝাঁপাইয়া পড়িবে কি না। এই মহান্ উদ্দেশ্যেই আমরা সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়াই বলিতেছি যে, আমরা পাশ্চাত্যদিগের নিকটে প্রবৃত্তির অনুকূল ভাব সকল ধার করিয়া লইতেছি—খাল কাটিয়া কুমীর আনিতেছি বলিলেও চলে।

নিবৃত্তির ভাব বিশেষভাবে প্রাচ্য এবং প্রবৃত্তির ভাব বিশেষভাবে প্রতীচ্য। প্রাচ্য-জগতের সমুন্নত অধ্যাত্মবিজ্ঞান তাহার নিবৃত্তি-ভাবের অস্তিত্বের সুপরিচয় দিতেছে; পাশ্চাত্য-দিগের সমুন্নত আইনবিজ্ঞান তাহার প্রবৃত্তি-ভাবের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা সকল কর্ম্মে দেখি অথবা দেখিতে উপদেশ দিই যে ধর্ম্ম কি বলিতেছেন; পাশ্চাত্যেরা কথায় কথায় দেখিতে চাহেন যে আইন কি বলিতেছে। একদিকে আমাদের বেদবেদান্ত প্রভৃতি আত্মার অনন্তকালের জন্য শান্তিবিধায়ক গ্রন্থ সকল; অপরদিকে রোমপ্রদত্ত পাশ্চাত্যজগতের রাশি রাশি আইন কানুনের গ্রন্থ—ইতিহাসের এই দুইটী বিষয় আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, নিবৃত্তি প্রাচ্যদিগের বিশেষ ভাব, প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যদিগের বিশেষ ভাব।

এই নিবৃত্তিভাবের বিশেষ লক্ষণ আত্মসং-

হরণ। আমাদের সকল কর্ম্মেরই ফলাফল ভগবানের প্রতি সমর্পণ করিয়া, তিনি যেরূপ শুভবুদ্ধি আমাদের অন্তরে প্রেরণ করিবেন, তদনুযায়ী কর্ম্ম করাই, এক কথায় আত্মসংহরণ করাই সমুন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রের এবং সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রেরও বিধি। এই ভাবটী সর্ব্বদাই মনে জাগ্রত রাখিবার জন্য আমাদিগকে ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করিতে হয়। ইহাতে নিবৃত্তিভাবের কাথটুকু রহিয়াছে বলিয়াই ইহা সেই অতি প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে আজিপর্য্যন্ত সমান-ভাবে সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। এই ভাবেই বিভোর হইয়া কোন প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকণ্ঠ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ বিষ্ণুপুরাণ।

যে ঋষি এই ক বলিয়াছিলেন, তিনি

প্রকৃতই একটী গভীর নিবৃত্তির ভাব এবং ঈশ্বরের উপর একটী গভীর নির্ভরের ভাব হই-তেই ইহা বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল আমরা এমনি প্রবৃত্তির বশীভূত হইতেছি যে, আমরা এমন সুন্দর নিবৃত্তিমূলক শ্লোকটীকেও নিজের ইচ্ছামত প্রবৃত্তির অনুকূলে অর্থ করিয়া লইয়া অধঃপাতের পথ হইতে মানসিক বাধা-সকলও অপসরণ করিতে উদ্যত হই। হিন্দু-জাতির মধ্যে এই নিবৃত্তির ভাব প্রবল থাকা-তেই একসময়ে ভারতের কত উন্নতি হইয়াছিল এবং আমাদের বিশ্বাস যে ইহারই ফলে শত শত বৎসর দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া, শত শত বৎসর কঠোর অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভারত জগতের পৃষ্ঠে আপনার অস্তিত্ব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রাখিতে পারিয়াছে। এই নিবৃত্তির ফলে যেরূপ শান্তিভাব আসিয়াছিল, গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাহার চিহ্নমাত্র দেখিয়া যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিবার অধিকারী এবং তাহাতে আমাদের হৃদয়মন আবার সেই গভীর শান্তিভাব এদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তাঁহারা দেখিয়াছেন

যে লোকদিগের গৃহদ্বারে চাবি লাগাইবার প্রয়োজন ছিল না; লোকেরা প্রায় সকলেই সত্যবাদী ছিল, সুতরাং মোকদ্দমার বাহুল্য ছিল না; তখন রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিলেও কোনরূপ উপদ্রব অত্যাচারের সম্ভাবনা ছিল না।* সমস্ত জাতির পক্ষে ইহা কি কম সম্মানের কথা ও কম শুভজনক? এই নিবৃত্তিকে আমাদের কেন্দ্র করাতেই আমরা অহিংসা প্রভৃতি উচ্চতম ভাব-সমূহকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গমধ্যে পরিগণিত করিতে সমর্থ হইতেছি। এইরূপে আমরা আত্মসংহরণকে মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত-পক্ষে সমগ্র জগতের মনোরাজ্যে আত্মকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

অপরদিকে, প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ আত্ম-কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা। পাশ্চাত্যেরা এই আত্ম-কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়া প্রকৃত পক্ষে আত্মসংহরণ আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই আত্মসংহরণ অধ্যাত্মরাজ্যের আত্মসংহরণ, যাহার বিষয় পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহা

* হণ্টার প্রভৃতি মহোদয়গণের লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখ।

নহে—ইহা প্রকৃতই আত্মসংহরণ বা আত্মবিনাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে পরেরও বিনাশ সাধন। পাশ্চাত্যগণ এই প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইয়াই আপনাদের তৃপ্তিসাধনের জন্য কত দেশপল্লী, নগরগ্রাম কামানের মুখে উড়াইয়া দিতেছে; আত্মতৃপ্তির জন্য সমস্ত পৃথিবীকে দোহন করিয়াও যেন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। রোমীয় সাম্রাজ্য যখন উন্নতির শিখরে, তখন তাহা প্রবৃত্তিরও শিখরে দণ্ডায়মান ছিল। বিলাসিতা সমস্ত সাম্রাজ্যকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই অচিরেই তাহার অতি কঠোর পতন ঘটিল। বর্ত্তমানেও দেখি যে, সমস্ত ইউরোপ যেমন উন্নতির শিখরে দাঁড়াইয়া আছে, সেইরূপ প্রবৃত্তিরও শিখরে দাঁড়াইয়া আছে। ইউরোপ যদি শীঘ্রই প্রবৃত্তির প্রতিকূলে না ফিরিয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ভাবিতে কিরূপ আতঙ্ক হয় যে, এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র ইউরোপ একটী অতি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডরূপে সমরসজ্জিত হইয়া আছে। এই প্রবৃত্তির অধীন হইবার ফলে ইউরোপের গার্হস্থ্য-জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। একদিকে স্ত্রীলোকেরা গাত্রের চর্ম্মভেদ প্রভৃতি নানা উপায়ে

গাত্রের অভ্যন্তরে সুগন্ধি দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া আমোদ করিবেন, * অপরদিকে পুরুষেরা (আজ কাল স্ত্রীলোকেরাও) হোটেল প্রভৃতি স্থানে পাঁচজন ইয়ারের সহিত বাসা বাঁধিয়া থাকিবেন; অনেকেই সহজে গার্হস্থ্যজীবনের নিবৃত্তিমূলক বন্ধনের ভিতরে আসিতে চাহে না। বহুদিন ধরিয়া এইভাবে ইউরোপ চলিতে থাকিলে তাহার বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলিবার জন্য ভবিষ্যৎ-গণনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় না বলিয়াই বোধ হয়।

পাশ্চাত্যদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহাদের সমাজ-নিয়ম প্রভৃতি সমবেত হইয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তির অভিমুখে চালিত করিতেছে। সমগ্র বাইবেলটী পড়িলে তাহাতে প্রবৃত্তিরই অনুকূল কথা, দ্বেষহিংসার কথাই অধিক দেখা যায়। বাইবেলের আদিতে আদম ও ঈবের নিষিদ্ধ ফল সেবন এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের ক্রোধোৎপত্তি ও স্বর্গ হইতে আদম ও ঈবের তাড়িত হওন। এইরূপে বাইবেলের আদিতে প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য দেখা যায়। বাইবেলের অন্তে অভিশাপ—যে কেহ বাইবেলের একটি অক্ষর বৃদ্ধি বা হ্রাস

* ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশ।

করিবেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ; ইহাও প্রবৃত্তিমূলক। ইহার প্রতিকূলে আমাদের কেমন উদার ও সার্ব্বভৌমিক মত যে, যে যে পথ দিয়াই চলুক না কেন, অবশেষে ভগবানের ক্রোড়ে সকলেই আশ্রয় পাইবে—"নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সার্ণবইব।" এরূপ উদার মতের উৎপত্তির হেতু একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার নিবৃত্তিমূলক অভাব। বাইবেলে যে নিবৃত্তির আশ্রয়ত্ত্ব নাই তাহা নহে, তাহা না থাকিলে কোন ধর্ম্মই দাঁড়াইতে পারে না। বাইবেলে যে নিবৃত্তিকথা আছে, এখন পাশ্চাত্যদিগকে প্রবৃত্তির পথ হইতে ফিরাইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট; কিন্তু তাহাতে নিবৃত্তি অপেক্ষা প্রবৃত্তিভাবই প্রবল থাকাতে ততটা সহজে ফিরাইতে পারিতেছে না।

আবার পাশ্চাত্যদিগের সমাজনিয়মও প্রবৃত্তির বড়ই অনুকূল। তাহাদের নৃত্য, তাহাদের বিবাহপদ্ধতি, তাহাদের পূর্ব্বানুরাগ-প্রথা, এসকলই প্রবৃত্তির অনুকূল পথেই লইয়া যায়। এখন তাহাদের প্রবৃত্তি-স্রোত এত ভীষণবেগ ধারণ করিয়াছে যে তাহা আর সহজে বন্ধনের ভিতর থাকিতে চাহিতেছে না। তাহাদের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি-স্রোতও

দিন দিন ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে। দিন দিন বিলাসিতা, আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ সকল তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টায় নিরন্তর ফিরিতেছে। হায়! পাশ্চাত্য দেশে এমন প্রশ্নও উঠিয়াছে যে, আত্মহত্যা সভ্যতব্যতার একটী লক্ষণ কি না! ইউরোপের মধ্যে দেখা যায় যে, যে দেশ যত সভ্যভব্য, সেই দেশ আত্মহত্যা বিষয়ে তত অগ্রসর। পর্টুগল, আয়র্লণ্ড, স্পেন, হঙ্গেরী ইতালী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সর্ব্বশেষে জর্মনি আত্মহত্যাবিষয়ে যথাক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান গ্রহণ করিতেছে। মদ্যপান, কামবৃত্তি, ঈর্ষা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমূহ ইহার উৎপত্তির মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। * ইহার সহিত হিন্দুদিগের এই বিষয়ে শিক্ষা তুলনা করিলে মন্দ হয় না। হিন্দুদিগের এই শিক্ষা আছে যে আত্মহত্যা করিলে ধর্ম্মহানি হয়, পাপ হয়— সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, কিন্তু আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নাই। এইরূপ কঠোর ধর্ম্মশাসন থাকাতে হিন্দুজাতি আত্মহত্যা বিষয়ে অত্যন্ত পরাঙ্মুখ। তবে সম্প্রতি ইউরোপীয়

---

* Pearson's magazine Christmas number.

সভ্যভব্যতার তরঙ্গ আসিয়া যতই আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, যতই প্রবৃত্তির বৃথা উদ্দীপক নবেল নাটক দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, ততই আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ সকলও আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে।

ইউরোপে কোন কোন দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ বিপদসঙ্কুল প্রবৃত্তিস্রোতকে কি যুক্তিবলে প্রশস্ত করিয়া দেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপে ফ্রান্সের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। ফ্রান্সের রাজধানীর লোকেরা নাকি ভব্যতম এবং প্রবৃত্তির স্রোতে দিবানিশি নিমগ্নপ্রায় থাকে, তাই বুঝি পারিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া যেটুকু ধর্ম্মের বন্ধন ছিল, তাহাও ঘুচাইয়া দিলেন—আদেশ করিলেন যে সরকারী বিদ্যালয়ে এমন একখানি পুস্তক পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে না, যাহাতে ঈশ্বরের কোন প্রকার নাম আছে। ইহার ফলে যে যৌবনোন্মত্ত বালকদিগের দুর্নীতিপরায়ণতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইরে, তাহা বলাই বাহুল্য। দুর্নীতিপরায়ণতা বর্দ্ধিত হইলে দেশের পতনও অনিবার্য্য। এই দুর্নীতি-বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপে পারিসের লোকসংখ্যা

কমিয়া যাইতেছে। এবং যখন রাজধানী সমস্ত দেশের আদর্শ স্বরূপ, তখন ইহাও অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে যে সমস্ত ফ্রান্সদেশে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তজ্জন্ম তাহার লোক সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। এই কথা আমরা মিথ্যা বলিতেছি না, বিলাতের কোন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার এক সুবিখ্যাত লেখক ইহা লিখিয়াছেন। *

এইরূপে প্রবৃত্তির অনুকূলে চলিবার ফলে পাশ্চাত্যখণ্ডে এত বিচারালয়, এত সভাসমিতি, এত আইনকানুন ও এত সৈন্যসামন্তপ্রহরী বিদ্যমান থাকিলেও তাহা যেন অশান্তির একটা ভীষণ আগার হইয়া উঠিয়াছে; তথায় কেহ যেন হাঁপ ছাড়িতে অবকাশ পায় না। বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, সংবাদপত্রের হুড়াহুড়ি প্রভৃতি এই অশান্তির যৎসামান্য বহির্বিকাশ মাত্র। এইরূপ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অত্যাচার ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইয়া ইহার কঠোর ফল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সমগ্র পাশ্চাত্যখণ্ড হইতে এক অতি কাতর দীর্ঘ-

* Mr. Stoddard Dawey in the Westminster Review.

নিষ্কাশ উঠিয়াছে। ইহার তুলনায় আমরা দেখি যে, আর্য্য ঋষি মুনিগণ আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্ম ধর্ম্মসংযুক্ত করিয়া দিয়া কি সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতারই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সুন্দর বিধি ব্যবস্থার ফলে আজও আমরা গর্ব্বের সহিত ও গৌরবের সহিত মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি; এবং তীব্র অসোয়াস্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গভীর শান্তি-ভোগে সক্ষম হইতেছি।

এতদূর পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহাতে এমন যেন কেহ মনে না করেন যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে উদ্দাম প্রবৃত্তির অতিরিক্ত নিবৃত্তির কোন প্রকার ভাবই পাওয়া যায় না, অথবা প্রাচ্য ভারতবর্ষ একেবারে নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া আপনার পরম কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে। ঈশ্বরের মঙ্গলভাব হইতে কেহই সম্পূর্ণ বিচ্যুত থাকিতে পারে না, একথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা নিশ্চয়ই জানিতেছি যে পাশ্চাত্য দেশসমূহেও নিবৃত্তিভাব কার্য্য করিবেই। আর বাস্তবিকও যে পাশ্চাত্য জনগণের হৃদয়ে নিবৃত্তিভাব প্রবৃত্তিভাবের উপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, চিকাগো নগরের মহা

ধর্ম্মমণ্ডলের প্রতিষ্ঠাই তাহার সুপরিচায়ক। যাই হউক, পাশ্চাত্যেরা তো ধীরে ধীরে সুপথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, আমরা পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা অধিকতর পাপী। ঈশ্বরের এমন প্রকৃষ্ট দান নিবৃত্তিতত্ত্ব আমরা হাতের মধ্যে পাইয়াও যে তাহাকে অবহেলা করিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির শরণাপন্ন হইতে ছুটিয়াছি, আমাদের ন্যায় দোষী ব্যক্তি কোথায়? আজকাল নিবৃত্তির নামোচ্চারণ করিলেই অনেক সুপণ্ডিত স্বদেশীয় ব্যক্তি সন্দেহ করেন যে, আমরা নিবৃত্তির নামে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকলকে নিদ্রিত থাকিতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উপদেশ দিই। এরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা অসম্ভব এবং সমূহ অমঙ্গলের কারণ বলিয়া তাঁহারা বিপরীত দিকে প্রবৃত্তির বড়ই পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের ইহা ভুল। আমরা নিবৃত্তির নামে লোক সকলকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিই না—বরঞ্চ তাহার বিরুদ্ধেই উপদেশ দিতে চাহি। এইরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকাই তো এক দুষ্প্রবৃত্তি এবং যথার্থই রাশি রাশি দুষ্প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ। আমরা এই কথা

বলি যে, আমাদিগকে প্রবৃত্তিস্রোতে তো যাই-তেই হইবে—কাহারও সাধ্য নাই যে আমা-দিগকে প্রবৃত্তির একেবারে অতীত করিয়া দিতে পারে। তবে প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইয়া সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিলে যে কোন্ আবর্ত্তের মধ্যে যাইয়া একেবারে নিমগ্ন হইব, কোন্ অন্ধকারময় পূতিগন্ধময় স্থানে নিক্ষিপ্ত হইব, তাহার ঠিকানা থাকিবে না। সেই কারণে যাহাতে প্রবৃত্তিস্রোতে পড়িয়া কূলকিনারা না পাইয়া একেবারে ভাসিয়া না যাই, অসহায় হইয়া না পড়ি, তজ্জন্যই আমাদের নিবৃত্তিকে অথবা সংযমকে সর্ব্বকর্ম্মেই সর্ব্বতোভাবে সহায় গ্রহণ করা উচিত। আমরা যখন বলি যে, নিবৃত্তিকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার অর্থ এই যে, আমাদের প্রবৃত্তিসমূহকে নিবৃত্তির আশ্রিত করিতে হইবে, অর্থাৎ সংযমসহায় করিয়া সমুদয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে; এবং আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, ইহাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার উপদেশ। যেমন ইউরোপে এক সময়ে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান, উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল; কিন্তু এখন যেমন উভয়ের মধ্যে দিন দিন সদ্ভাব বর্দ্ধিত

হইতেছে এবং এখন যেমন উভয়ে মিলিত হইয়া সেই বিশ্বপতি ত্রিভুবনপালকের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, সেইরূপ যে দিন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শান্তি ও আনন্দের মলয়বায়ু আনয়ন করিবে, ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, সেই দিন পাশ্চাত্য দেশের জয়; সেই দিন ভারতের জয়, মানবজাতির জয়, নীতির জয়, ধর্ম্মের জয় এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সত্যের মূলাধার ভগবানের জয়।

এখন, এই নিবৃত্তিভাব আমরা পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথার মধ্যে দেখিতে পাই। কবির বিশেষ রচনানৈপুণ্য না থাকাতে অধিকাংশ স্থানে এই নিবৃত্তিভাব পরিস্ফুট হয় নাই; কিন্তু সমস্ত কথাটী একটু মনোযোগের সহিত পড়িলেই বুঝা যায় যে কবি হরিশ্চন্দ্রকে এই নিবৃত্তিভাবের আদর্শকেন্দ্রে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, তবে ততটা সফল হন নাই। কিন্তু কবি যতটুকু করিয়াছেন, সেইটুকুরও জন্য পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। হরিশ্চন্দ্র যখন চণ্ডালের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে মৃতকম্বল সংগ্রহ করিতে-

ছেন—সে ভাব কি মহান্! এবং সর্ব্বশেষে যখন হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে স্বর্গগমনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বলিতেছেন "আমার ভক্ত প্রজাগণ কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি সুদীর্ঘ স্বর্গভোগেরও ইচ্ছা করি না, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে যদি একটী দিনও আমার স্বর্গভোগ হয় তাহাও শ্রেয়"—সে ভাব কি মহান্! এমন ভাব জানি না অন্য কোন্ ভাষার কোন্ গ্রন্থে আছে। অন্ততঃ কবির এই শেষ উক্তির জন্যও তাঁহাকে শতবার নমস্কার করি।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন ইতিহাসের সম্মান রক্ষার জন্য, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা বৈদিক হরিশ্চন্দ্রকথা অথবা শৌনঃশেপ আখ্যান পরিত্যাগ করিতে পারি না, সেইরূপ আমাদের সম্মুখে নিবৃত্তির উচ্চ আদর্শ স্থাপনের জন্য আমরা পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিব না—উভয়ই আমাদের অতি প্রিয় বস্তু, উভয়ই সমস্ত ভারতের গৌরবের সামগ্রী।

ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারং।

ওঁ

পুস্তক একখানি অমূল্য গ্রন্থ। নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত এই পুস্তক যে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিবে, তাহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। সঞ্জীবনী।

"That it affords food for all, irrespective of their creed, cannot be gainsaid, written as it is on a catholic and scientific basis." The Thesophist.

"The utterances teem with a wealth of information, astronomical, geological and theological." The Indian mirror.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—(শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা সমেত শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র, মাঃ ৵৹ দুই আনা। সংবাদ পত্রাদিতে বিশেষ প্রশংসিত।

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৮৹ আনা, মাঃ অর্দ্ধআনা, ইহাতে হার্বার্ট স্পেনসর প্রভৃতি পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদীদিগের নাস্তিক্যপ্রবণ মত খণ্ডন করিয়া ভারতের সনাতন অধ্যাত্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

এই পুস্তক পাঠ করিলে ধর্ম্মে আস্থা হইবে, তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

মাননীয় জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ইহাতে দর্শনশাস্ত্রের কতকগুলি নিগূঢ়তত্ত্ব-কথা অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষায় এরূপ গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালিসমাজে যে এপ্রকার গ্রন্থ সম্যক্ সমাদৃত হইবে. তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"This is a refutation of agnosticism, such as is preached by Herbert Spencer, Tyndal, and other modern thinkers. The writer, whose general education and theological attainments well befit him for the task, which he has undertaken, starts by defining *Atma* and describing its properties, and then establishes by the production of evidence, from both the outer and inner worlds, the existence of the Supreme Soul. Even a cursory glance at the volume before us, will convince any reader of the extent of the author's learning and argumentative powers, and, above all, his religious earnestness. *Lucidity of style in dealing with an abstruse subject is one of the striking features of the work.*

The Indian mirror.